কাজী আনোয়ার হোসেন

অন্ধ শিকারী

দ্বিতীয় খণ্ড

মাসুদ রানা

অন্ধ শিকারী ২

কাজী আনোয়ার হোসেন

অবাক কাণ্ড, কেজিবির এক মানবতাবাদী
জেনারেলই ফাঁস করে দিলেন মস্কোর ষড়যন্ত্র।
লণ্ডন ছুটলেন রাহাত খান, সোহেল আহমেদ।
সব জানানো হলো মাসুদ রানাকে।
কিন্তু একা কি করবে ও? কি করার আছে?

অন্ধের মত একই জায়গায়
ঘুরপাক খাচ্ছে মাসুদ রানা!
জানে, আশেপাশেই রয়েছে সে।
কিন্তু কোথায়?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২১৮

অন্ধ শিকারী ২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ তৌকির কবির তুষার

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা-২১৮

অন্ধ শিকারী

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

তেইশ টাকা

ISBN 984 - 16 - 7218 - 9

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-218
ANDHO SHIKARI
Part-II
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়
মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস
ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন
বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ
যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা
যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ* অন্ধ শিকারী

এক

বিপজ্জনক! অন্যমনস্কের মত মাথা দোলালেন ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ, অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলায় মেতেছেন জেনারেল সেক্রেটারি। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে অকল্পনীয় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। পুরো পৃথিবী তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, তেমন মুহূর্ত যদি উপস্থিত হয়, নিজ বলয়ের বন্ধু দেশগুলোর সহানুভূতিও পাবে না সোভিয়েত ইউনিয়ন। মুখ ঘুরিয়ে নেবে সবাই, কারণ এ কাজে হাত দেয়ার আগে তাদের জানানোই হয়নি।

তাদের কথা না হয় বাদ, ভাবছেন বরিসভ, কেজিবিকে পর্যন্ত সামান্য আভাস দেয়া হলো না, এ কী আজব কথা! গ্রু আছে, কেজিবি নেই! কেউ কখনও শুনেছে এমন ছন্নছাড়া অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কথা?

যদিও বরিসভ জানেন, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার জেনারেল সেক্রেটারির রয়েছে। গোটা বিশ্বকে যে-কোন মুহূর্তে পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখেন তিনি, বরিসভ একশোবার স্বীকার করেন। কিন্তু সে জন্যে ক্ষেত্র তো চাই! কি, না, লেবার পার্টিকে জেতাবার জন্যে দেড় মেগাটন ক্ষমতাসম্পন্ন একটা নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাতে চলেছেন তিনি ব্রিটেনের কলজের মধ্যে! পাগলামিরও তো একটা সীমা আছে।

দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভাল করে দু'চোখ রগড়ালেন জেনারেল বরিসভ। কাল সারা রাত ঘুমাতে পারেননি। দুই চোখের ধারেকাছেও আসেনি ঘুম। বিছানায় ছটফট করে কেটেছে তাঁর। প্রথমে ক্রোধ, পরে বিস্ময় এবং সবশেষে অজানা এক ভয় চেপে বসেছে ভেতরে একটু একটু করে। ডক্টর পাভলভের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকেই সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে আছেন জেনারেল কি হয় কি হয় ভেবে।

ড্রয়ার থেকে একটা মাইক্রো ক্যাসেট রেকর্ডার বের করলেন তিনি। কাল জিনিসটা পোর্ট ফোলিওর ভেতরে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ড. পাভলভের বাসায়। প্ল্যান অরোরা সম্পর্কে কায়দা করে ডক্টরের পুরো বক্তব্য রেকর্ড করে এনেছেন। কাল বাসায় ফিরে এবং আজ অফিসে এসে অসংখ্যবার বাজিয়ে শুনেছেন তাঁদের দু'জনের কথোপকথন। তবু যেন আশ মেটে না। বারবার শুনতে মন চায়।

ফিতে পুরোটা পিছিয়ে আনলেন জেনারেল, তারপর ভল্যুম ফুল করে 'প্লে' বোতাম টিপে দিলেন।

'...শুরু হয়েছে মাস দুয়েক আগে,' ড. পাভলভের গলা শোনা গেল। 'আমরা কেউ এ ব্যাপারে জানতাম না কিছুই। জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কো এর হোতা। গত গ্রীষ্মে নিজের সামার রিট্রিটে ছুটি কাটানোর সময়, ব্রিটেনের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভদের পরাজিত করে লেবার পার্টিকে কী উপায়ে ক্ষমতায় আনা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত এক রিপোর্ট তৈরি করেন তিনি। এবং ছুটি শেষে মস্কো ফিরে সেটা সাবমিট করেন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির সামনে। ওতে জেনারেল দাবি করেন, ব্রিটিশ লেবার পার্টির ভেতরকার হার্ড লেফট উইঙ, অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ক্যাডারের সহযোগিতায় কাজটা প্রায় অনায়াসেই করা সম্ভব।'

'কি ভাবে?' জেনারেল বরিসভের প্রশ্ন।

'বলতে দিন।'

'শিওর।'

'জেনারেলের মত, যদিও আমরাও তাই মনে করি, নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়ী হবে এবং পার্টি প্রধান নীল কিনকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করবে। এর ঠিক পরপরই শুরু হবে জেনারেল মার্চেঙ্কোর প্রার্থিত "আসল খেলা"। জেনারেল, আপনার মনে আছে, ১৯৮১ সালের ৭ মে বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল নির্বাচনের মাত্র ষোলো ঘণ্টা পর কি ঘটেছিল?'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। 'না, কমরেড। মনে করিয়ে দিলে বাধিত হব।'

'ওয়েল। স্যার হোরেস কাটলারের নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টি ছিল তখন গ্রেটার লণ্ডন কাউন্সিল বা জিএলসি'র নেতৃত্বে। সেদিনের নির্বাচনে অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা অ্যাণ্ড্রু ম্যাকিনটোশের লেবার পার্টি জয়ী হয়। এই বিজয়ের ষোলো ঘণ্টা পর, মাইণ্ড ইট, মাস নয়, সপ্তা নয়, এমন কি একটি দিনও পুরো হওয়ার সুযোগ হয়নি, মাত্র ষোলো ঘণ্টা পর পার্টি গভর্নিং কমিটির এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সিদ্ধান্তে দলীয় প্রধানের পদটি হারাতে হয় ম্যাকিনটোশকে। সে পদে বসানো হয় কেন লিভিংস্টোন নামে এক কট্টর বামপন্থী অ্যাকটিভিস্টকে। এর আগে পাঁচ শতাংশ সাধারণ লণ্ডনবাসীও যার নাম পর্যন্ত শোনেনি জীবনে কোনদিন। অবশ্য খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে কেন লিভিংস্টোনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন ম্যাকিনটোশ। ওটা ছিল ব্রিটিশ মার্কস-লেনিনপন্থীদের শতাব্দীর সেরা বিজয়।

'রাজনীতিক হিসেবে কেন লিভিংস্টোন ছিলেন সাংঘাতিক চৌকস। জনগণ না চিনলেও দলের প্রত্যেকে খুব ভাল করেই চিনত তাঁকে। খুব অল্প বয়সে মার্কস্ এবং লেনিনবাদে উদ্বুদ্ধ হন তিনি। পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ

পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বড় নেতাদের নজর পড়ে তাঁর ওপর। কারণ লিভিংস্টোন সেই ধরনের রাজনীতিক, যাঁর চব্বিশ ঘণ্টার ধ্যান-জ্ঞানই ছিল রাজনীতি। লেবার পার্টির কোন সভায় লিভিংস্টোন উপস্থিত নেই বা ছিলেন না, এমন অভিযোগ তাঁর চরম শত্রুও করতে পারবে না। তা সে যতই গুরুত্বহীন বৈঠক হোক না কেন।

'সে যা-ই হোক। জিএলসি প্রধান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর লিভিংস্টোন কাউন্টি হলকে মার্কস-লেনিনপন্থীদের স্প্রিংবোর্ড হিসেবে গড়ে তোলেন। যা-তা কথা নয়, কমরেড জেনারেল। গ্রেটার লণ্ডনের জনসংখ্যা এখন এগারো মিলিয়ন। সারা দেশের জনসংখ্যার প্রায় বিশ শতাংশ। যা লিখটেনস্টেইন বা লুক্সেমবুর্গের মত মিনি স্টেটের জনসংখ্যার চাইতেও বেশি। আর লণ্ডন শহরের বাজেট? জাতিসংঘের আশিটি সদস্য দেশের মিলিত বাৎসরিক বাজেটের চাইতেও বেশি।'

'আমরা বোধহয় আসল বক্তব্য থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি, কমরেড,' জেনারেল বরিসভের কণ্ঠে ধৈর্যের অভাব ঘটার আবছা ইঙ্গিত।

'হ্যাঁ। খানিকটা। আসন্ন নির্বাচনে লেবার পার্টি কী করে বিজয়ী হবে, সে কথায় একটু পরে আসছি। আগে শুনুন পরে কি ঘটবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর অ্যাণ্ড্রু ম্যাকিনটোশের মতই পার্টি প্রধানের পদটি হারাবেন বর্তমান নেতা নিল কিনক। সেই একই উপায়ে পদচ্যুত করা হবে কিনককে। তাঁর জায়গায় বসানো হবে এক কট্টর মস্কোপন্থী, আই মীন, হার্ড লেফটিস্টকে।'

'কি নাম তার?'

'দুঃখিত। জানা নেই আমার।'

'শুনে মনে হয় জেনারেল মার্চেঙ্কোই সব করেছেন। তাহলে আপনারা তিনজন কেন এর মধ্যে?'

'কমরেড জেনারেলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যাতে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমাদের কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। তাঁর নির্দেশ ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারার, সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হয়েছে।'

'এক পাখি নিশ্চয়ই কনজারভেটিভ পার্টি?'

'হ্যাঁ।'

'অন্যটা?'

'ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে সব ধরনের মার্কিন সামরিক স্থাপনা তুলে নিতে ওয়াশিংটনকে বাধ্য করা। অবশ্যই ব্রিটিশ জনমতের চাপে।'

'কি রকম?'

'নির্বাচনের প্রচারণার শুরু থেকেই এসব স্থাপনার ক্ষতিকারক দিক এবং সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ভয় ভীতি ঢোকানোর চেষ্টা চালিয়ে আসছে লেবার পার্টির হার্ড লেফ্‌ট উইঙ। ন্যাটো নিয়ন্ত্রিত ও দেশে মার্কিন এবং ইঙ্গ-মার্কিন যতগুলো সামরিক ঘাঁটি আছে, সবগুলোতেই পারমাণবিক বোমা, মিজাইল মজুত আছে। ওগুলো নিয়েই ভয়-ভীতি ছড়ানো হচ্ছে তাদের মধ্যে। যে কোন সময় ওর যে কোন একটায় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, যা হবে চেরনোবিল দুর্ঘটনার চাইতেও ভয়ঙ্কর, তাতে হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হতে পারে, এই সমস্ত বলে আর কি! সেই সঙ্গে তাদের বোঝানো হচ্ছে, লেবার পার্টি ক্ষমতায় গেলে আমেরিকানদের সঙ্গে সব সামরিক সহযোগিতা চুক্তি বাতিল করে দেয়া হবে, ন্যাটোর সব ঘাঁটি তুলে দেয়া হবে ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে।

'ওঁদের ভীতির আগুনে ঘি ঢালার আয়োজন করা হয়েছে। নির্বাচনের সপ্তাখানেক আগে সত্যি সত্যি ছোটখাট একটা পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটবে এক মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে।'

'এ পরামর্শটা কার?' এই জায়গায় সিধে হয়ে গিয়েছিলেন জেনারেল বরিসভ। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিলেন ড. পাভলভের দিকে।

'কমরেড জেনারেল মার্চেঙ্কোর।'

'কি করে ঘটবে আপনাদের সো কলড় দুর্ঘটনা?'

'একজন টপ্ ক্লাস সোভিয়েত এজেন্ট ইনফিলট্রেট করবে ইংল্যাণ্ডে। তার হাতে বিভিন্ন দিক থেকে নয়টা নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির সরঞ্জাম পৌছে দেয়া হবে। ওগুলো জুড়ে বোমা তৈরি করা হবে, তারপর বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। কাজটা এমনভাবে করা হবে, যাতে সবাই পরিষ্কার বোঝে যে ওটা দুর্ঘটনাই, এবং মার্কিনীদের অসাবধানতার জন্যেই ঘটেছে। সাফোকের বেন্টওয়াটার্সে মার্কিনীদের এফ-ফাইভ স্ট্রাইক বিমান ঘাঁটিটি বেছে নেয়া হয়েছে এ জন্যে। বেশ কিছু ট্যাকটিক্যাল নিউক্লিয়ার ডিভাইস মোতায়েন আছে ওখানে। সম্ভাব্য সোভিয়েত সামরিক হুমকি মোকাবেলার জন্যে।'

'কত কিলোটন ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা ফাটানো হবে?'

'বেশি না, দেড় কিলোটন। বড় বোমা হলে ক্ষয়ক্ষতি হবে প্রচুর, তাতে নির্বাচনই পিছিয়ে যাবে। এই দুর্ঘটনার পর লেবার এমপিদের আর ভোট চাইতে হবে না, কম করেও আশি পার্সেন্ট ভোট পাবে তারা। আরও আছে। জানা কথা, এ ব্যাপারে মার্কিন প্রতিক্রিয়া হবে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত। সরাসরি অস্বীকার করবে তারা যে এ দুর্ঘটনার জন্যে তারা দায়ী নয়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এর পরদিন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি রেডিও-টিভিতে ভাষণ দেবেন। তাতে বিশ্বাবাসীকে জানানো হবে আমেরিকানরা উন্মাদ হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে দেশ এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সোভিয়েত ফোর্সেসের জন্যে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করা ছাড়া তাঁর কোন বিকল্প নেই।

'ওই দিনই লণ্ডনের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত স্বয়ং মিস্টার নিল কিনককে মস্কো সফরে যাওয়ার আহ্বান জানাবেন। অনুরোধ করবেন তিনি যেন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ জটিলতা নিয়ে আলোচনা করেন, মানবতার স্বার্থে শান্তি প্রার্থনা করেন। ভোট নিজের পক্ষে টানতে হলে কিনকেরও কোন বিকল্প থাকবে না এ ছাড়া। আর আমাদের বিশ্বাস, ওয়ার্ল্ড প্রেসের হাজারো রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার আর টিভি ক্যামেরার সামনে তাকে মস্কো যেতে বাধা দেয়ার কথা ভুলেও চিন্তা করবে না কনজারভেটিভরা।

'কয়েক মিনিটের মধ্যে কিনকের ভিসা তৈরি হয়ে যাবে। পরদিন সকালে অ্যারোফ্লোটের বিশেষ বিমানে মস্কো যাবেন কিনক। কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি তাঁকে রিসিভ করবেন, দু'জনে বৈঠক করবেন। তারপর ফিরে আসবেন কিনক। তাঁর বিমান হিথ্রো ল্যাণ্ড করার আগেই আবার রেডিও-টিভিতে ভাষণ দেবেন কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি। জানাবেন, ব্রিটিশ লেবার পার্টি প্রধানের আবেদনে সাড়া দিয়ে আর্মর্ড ফোর্সেসকে গ্রীন স্ট্যাটাসে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

'এরপর, ভোটের আগের দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন নিল কিনক। ঘোষণা করবেন, তাঁর পার্টি নির্বাচিত হলে শান্তির উদ্দেশ্য ছাড়া কোনরকম সামরিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। ওদিকে, সবার ধারণা, এই ক'দিনে ব্রিটেন আর আমেরিকার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী মৈত্রী খান খান হয়ে যাবে। বাধ্য হয়েই সমস্ত সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার করতে হবে ওয়াশিংটনকে। অন্য সব পশ্চিম ইউরোপীয় দেশেও একই দুর্গতি ঘটবে তার, মৈত্রীর বন্ধন ছিঁড়ে পালিয়ে আসার পথ পাবে না ওরা।'

'তারপর?' জেনারেল বরিসভের থমথমে কণ্ঠের প্রশ্ন।

'তারপর নির্বাচনে বিজয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পার্টির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কিনককে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। বসানো হবে এক হার্ড লেফটিস্টকে। গ্রেট ব্রিটেনের প্রথম মার্কস-লেনিনবাদী প্রধানমন্ত্রী হবে সে।'

'উদ্দেশ্য?'

'ক্রমান্বয়ে সামরিক দিক থেকে ব্রিটেনকে নির্জীব করা। তারপর একে একে আর সব পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোকেও। এসব পরিকল্পনা অনেক আগেই সেরে ফেলেছেন জেনারেল মার্চেঙ্কো। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে, গোটা পাঁচেক পদক্ষেপ নেবে লেবার পার্টি। যার মধ্যে আছে, যত বাধ্যবাধকতাই থাকুক, সব চুক্তি বাতিল করে ইইসি থেকে ব্রিটেনের প্রত্যাহার। অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর আকার এক পঞ্চমাংশে নামিয়ে আনা, সকল পারমাণবিক বোমা ধ্বংস ও হারওয়েল আর অ্যালডারমাস্টনের অ্যাডভান্সড ওয়েপনস্ রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্টের বিলুপ্তি। ব্রিটেন থেকে সকল মার্কিন কনভেনশনাল এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্র ও পারসোনেল অপসারণ। এবং সবশেষে ন্যাটো জোট থেকেও ব্রিটেনের নিজেকে প্রত্যাহার।

'এসব পদক্ষেপ যদি নিতে সক্ষম হয় লেবার, চিরদিনের জন্যে মুখ থুবড়ে পড়বে ব্রিটেন, গুঁড়িয়ে যাবে মেরুদণ্ড। এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না কোনদিনও।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'কতটা ক্ষতি হবে এই বিস্ফোরণে?'

'বেন্টওয়াটার্স এয়ার বেস, রেনডলেসহ্যাম ফরেস্ট, তিনটে হ্যামলেট এবং পুরো একটা গ্রাম, সব বাষ্প হয়ে উবে যাবে।'

'কত লোকের মৃত্যু হবে?'

'তা…কয়েক হাজার তো বটেই।'

'কিন্তু যদি আমেরিকানরা ভেতরের ব্যাপার টের পেয়ে যায়? বা এ নিয়ে যদি কোন সন্দেহ দেখা দেয় ব্রিটেনের? যদি ধরা পড়ে যায় আমাদের এজেন্ট?'

'পড়বে না। এসব খুঁটিনাটি প্ল্যান করেছেন…'

'ভিক্টরোভিচ।'

'হ্যাঁ। লোকটিকে বলা হয়েছে, বোমার বাটন টেপার দু'ঘণ্টা পর বিস্ফোরণ ঘটবে। এই সময়ের ভেতর সে সরে যেতে পারবে নিরাপদ দূরত্বে। আসলে তা নয়। ওটার সীলড্ টাইমার ইউনিট তৈরি করা হয়েছে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের জন্যে। ধরা পড়ার প্রশ্নই আসে না তার।'

'বেচারা, মেজর ভ্যালেরি!' বরিসভের চাপা কণ্ঠ।

'কিছু বললেন, কমরেড জেনারেল?'

'অ্যাঁ? না। কিন্তু এটা যে দুর্ঘটনাই, তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করার কি ব্যবস্থা?'

'আছে। সে ব্যবস্থাও আছে। দুর্ঘটনার দিন সন্ধের পর এক ইসরায়েলি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ডক্টর নাহুম ওয়েজম্যান প্রাগে এক আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলন ডাকবেন। এ মুহূর্তে লণ্ডনে আছেন ভদ্রলোক, মার্কিন এক সামরিক স্থাপনায় কর্মরত। ভদ্রলোক কভার্ড রুশ এজেন্ট। সম্মেলনে ডক্টর জানাবেন, গত কয়েক বছর যাবত আমেরিকানদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে কাজ করছেন তিনি। ওই ঘাঁটিতে কিছু নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছিল আমেরিকানরা। কিন্তু ডক্টর নাহুম বার বার তাদের সতর্ক করে আসছিলেন যে ওয়ারহেডগুলো বিপজ্জনক।

'ব্যাপারটা হলো, বোমাগুলো আকারে বেশ বড়। ওগুলো নিয়ে উড়তে প্রচুর তেল লোড করতে হত বিমানে। এতে বিমানের গতিও পুরোপুরি

তোলা যেত না। তাই মার্কিনীরা ওগুলোর আকার ছোট করে আলট্রা স্মল ওয়ারহেডে পরিণত করার জন্যে কাজ করে চলেছে। ডক্টর ওয়েজার দাবি করবেন, ওগুলোকে ভেঙে ছোট করতে গিয়ে ওরাই এ বিপদ ডেকে এনেছে। কেউ অবিশ্বাস করবে না তাঁকে, কারণ ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্যি। এবং ডক্টর নাহুম বাস্তবিক পক্ষেই মার্কিনীদের এ গবেষণা বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। আরও কয়েকজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট এর সাক্ষী।'

ডক্টর নাহুমকে খুব ভাল করে চেনেন ভাদিম বরিসভ। বিপত্নীক ওয়েজম্যানের একমাত্র পুত্র ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ছিল এক সময়। '৮২ সালে বৈরুতে কর্মরত ছিল সে। যে রাতে ভারী অস্ত্রসজ্জিত ফালাঞ্জিস্ট বাহিনী ফিলিস্তিনী রিফিউজি ক্যাম্প শাবরা ও শাতিলায় গণহত্যা চালায় সে রাতেই তার মৃত্যু হয়।

ঘাতকদের নিরস্ত্র করার জন্যে জীপ নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল লেফটেন্যান্ট। তারাই হত্যা করে তাকে। কেজিবির ভাগ্য ভাল, লেফটেন্যান্টকে গুলি করা হয়েছিল উজি দিয়ে। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার দেহ থেকে উজির সাত সাতটি বুলেট বের করে ডাক্তাররা। সুযোগ চিনতে ভুল করেনি কেজিবি। শোকার্ত ডক্টর ওয়েজম্যানকে তারা বোঝাতে সক্ষম হয় যে ফালাঞ্জিস্ট নয়, ইসরায়েলি সৈন্যের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ছেলের। লিকুদ পার্টির নামও শুনতে পারতেন না ভদ্রলোক। চিরকাল বিরোধীদলের সমর্থক ছিলেন।

এই ঘটনার পর ঘৃণায়, ক্রোধে উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠলেন তিনি। যে সরকার তাঁর একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তার ক্ষতি করা যায় কি ভাবে, সারাক্ষণ সেই ফিকিরে থাকলেন। যখন মনে হলো সময় হয়েছে, আলগোছে এগোল কেজিবি। রাশিয়ার হয়ে আজীবন কাজ করে যাওয়ার

শপথ করলেন নাহুম ওয়েজম্যান।

সচকিত হলেন ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভ বরিসভ। হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলেন রেকর্ডার। কিন্তু আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। কাল রাত থেকেই তাড়িয়ে ফিরছে তাঁকে এ আতঙ্ক, জান্তব এক দুঃস্বপ্ন। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন জেনারেল, কিন্তু কোন পথ বের করতে পারেননি।

আসন ছাড়লেন বরিসভ। পায়চারি শুরু করলেন। মিনিট দশেক পর হঠাৎ করেই মাথায় এল আইডিয়াটা। দাঁড়িয়ে পড়লেন জেনারেল। দেখতে দেখতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। পাওয়া গেছে! মুক্তির পথ পাওয়া গেছে। তিনি একজন সরকারি চাকুরে। অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে তাঁর, যা থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

যে কারণে এ ব্যাপারে নিজে সরাসরি কিছুই করতে পারবেন না। এছাড়া পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির পিছনে লাগার পরিণতি...ভাবতেই শিউরে উঠলেন জেনারেল বরিসভ। সর্বনাশ হয়ে যাবে। জ্ঞাতি-গুষ্ঠি নিয়ে ধনে-প্রাণে মরতে হবে যদি জানাজানি হয়ে যায়। তাই বলে পিছিয়ে গেলেও চলবে না। বাধা দিতেই হবে। এর ওপরই নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইংল্যাণ্ডই নয়, এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সমগ্র মানবজাতিকে।

তা হতে দিতে পারেন না জেনারেল বরিসভ। হতে দেয়া যায় না। নিজে এর পিছনে লাগতে পারবেন না, ঠিক আছে। কিন্তু আর কাউকে সব জানিয়ে লাগিয়ে দিতে বাধা কোথায়? তাই করতে যাচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম ভ্যাসিলিয়েভিচ বরিসভ। বুকের ওপর চেপে বসা একটা ভার যেন নেমে গেল তাঁর হঠাৎ করেই। আতঙ্কিত দিশেহারা ভাবটাও কেটে যেতে থাকল একটু একটু করে।

*

চিকস্যাণ্ডস, বেডফোর্ডশায়ার। রাত এগারোটা। ইউএস মাস্টার সার্জেন্ট গ্যারি লুইস বসে আছে ব্রিটিশ-আমেরিকান লিসনিঙ স্টেশনের মাস্টার কম্পিউটরের সামনে। সুন্দরী ব্রিটিশ বান্ধবীর কথা ভাবছে সে মনে মনে। বেডফোর্ডে থাকে লুইসের বান্ধবী। সপ্তাহে একদিন মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় লুইস মেয়েটির সঙ্গে। রোববার।

কাল সেই দিন। এ দিনটির আগমনের প্রতীক্ষায় সপ্তাহের বাকি ছয় দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সার্জেন্ট। কাজেই মনটা আজ তার বেশ প্রফুল্ল। গুন গুন করে গান গাইছে। আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছে হাঁটুতে। চোখ মাস্টার কম্পিউটরের পর্দায়।

এটি ব্রিটিশ ইলেক্ট্রোনিক মনিটরিঙ অ্যাণ্ড কোড় ব্রেকিঙ কমপ্লেক্সের একটি শাখা। গ্লস্টারশায়ারের চেলটেনহ্যামে এর হেড অফিস। সংক্ষেপে গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশনস্ হেডকোয়ার্টার্স বা জিসিএইচকিউ বলা হয় একে। সারা দেশে এর অনেক শাখা রয়েছে। যার কয়েকটা যৌথভাবে পরিচালনা করে জিসিএইচকিউ এবং আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা এনএসএ। চিকস্যাণ্ডসের এ স্টেশনটিও তেমনি একটি।

অতীতের মত ইয়ারফোন কানে লাগিয়ে আত্মগোপন করে থাকা কোন শত্রু দেশের স্পাইয়ের মোর্স-কীর মাধ্যমে পাঠানো বার্তা ইথার থেকে উদ্ধার এবং তা রেকর্ড করার প্রাণান্তকর খাটুনির দিন গত হয়েছে অনেক আগেই। আজকাল সে কাজ করে কম্পিউটর। বার্তা কেবল রিসিভ আর রেকর্ডই করে না ইলেক্ট্রোনিক পরিবারের এই বিস্ময়কর জাদুর বাক্সটি, করে আরও অনেক অ-নে-ক কিছু।

অতএব চিন্তার কিছু নেই, জানে মাস্টার সার্জেন্ট গ্যারি লুইস। সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকারও প্রয়োজন নেই। বাতাসে যদি কোন

ইলেক্ট্রোনিক ফিসফিসানি ওঠে, ইথারে অস্বাভাবিক কম্পন ধরায়, তার মাথার ওপর, ভবনের ছাতে এরিয়েলের জঙ্গলে তা ধরা পড়বেই। পরমুহূর্তে তা লুইসের সামনের জাদুর বাক্সের মেমোরি ব্যাঙ্কে প্রবেশ করবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

এরপর পলকে ঘটে যাবে আরও অনেক কিছু। প্রথমেই মাস্টার কম্পিউটরের 'হিট' বাটনটি ঝপ্ করে বসে পড়বে নিজের এনট্রেইলে। মেসেজটা রেকর্ড হয়ে যাবে। এবার অটোমেটিক ব্যাণ্ড স্ক্যানার লেগে পড়বে নিজের কাজে। ফিসফিসানিটা কোত্থেকে এল, তার বিয়ারিঙ আত্মস্থ করে নেবে সে। তারপর সারা দেশের সবগুলো লিসনিঙ স্টেশনের ব্রাদার কম্পিউটরকে নির্দেশ পাঠাবে তার ক্রসবিয়ারিঙ গ্রহণের। এবং সবশেষে মৃদু 'পিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ' গান গেয়ে সতর্ক করবে ডিউটি অফিসারকে।

এগারোটা তেতাল্লিশ। আরও সতেরো মিনিট ডিউটি করতে হবে গ্যারি লুইসকে। তারপর মুক্তি। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে, কিন্তু কাজটা পুরো করতে পারল না। অদ্ভুত এক নাচের ছন্দে ত্যাড়াবাঁকা দেহটা শক্ত হয়ে গেল তার। নিমেষে কপালে উঠে গেছে চোখ, হাঁ বন্ধ করার কথা ভুলে গেছে। চোখের সামনে 'হিট' বাটনটা এনট্রেইলে বসে পড়েছে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না মাস্টার সার্জেন্ট।

বায়ুমণ্ডলে সারাক্ষণ ভেসে বেড়ানো শব্দজটের ভেতর অস্বাভাবিক একটা কিছু সনাক্ত করেছে মাস্টার কম্পিউটর। ইলেক্ট্রোনিক ফিসফিসানি! মাই গড! ঝট করে সিধে হয়ে বসল গ্যারি, ঝাঁপ দিল সামনের টেলিফোনের রিসিভার লক্ষ্য করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠল লিসনিঙ স্টেশন। হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

দু'মিনিট পর বোঝা গেল, কম্পিউটর যা সনাক্ত করেছে তা সেকেণ্ড তিনেক স্থায়ী জট পাকানো কিছু শব্দের এক গোলাক ধাঁধা ছাড়া আর

কিছুই নয়। অনেকগুলো শব্দ যেন আটকে রাখা হয়েছিল পাইপের ভেতর, ট্যাপের প্যাঁচ খুলতেই ফোয়ারার মত হড় হড় করে বেরিয়ে এল একযোগে। স্কোয়ার্ট বলা হয় একে। সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে প্রেরিত কোন ক্ল্যানডেস্টাইন মেসেজ (গোপন বার্তা)। অত্যন্ত নিরাপদ। যার মর্মোদ্ধার মানুষ তো দূরের কথা, কম্পিউটরেরও সাধ্যের অতীত।

এ জাতীয় বার্তা তৈরি করতে প্রচুর সময় এবং শ্রম ব্যয় হয়। প্রথমে বার্তাটা পরিষ্কার করে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখতে হয়। পরে তা রূপান্তর করা হয় কোডে। এরপর ক্যাসেট রেকর্ডার চালিয়ে মোর্স-কী টিপে ওটা রেকর্ড করা হয়। কী-র ট্যাপ ট্যাপ উঁচু-নিচু পর্দার আওয়াজের ভেতরই লুকিয়ে থাকে বার্তা। বলা বাহুল্য রেকর্ডারটি এ ধরনের 'বিশেষ কাজের' জন্যেই তৈরি।

এবার নির্দিষ্ট একটি বোতাম টিপলেই কয়েক ইঞ্চি ফিতে জুড়ে রেকর্ড হওয়া কী-র ট্যাপিঙের আওয়াজগুলো এগিয়ে এসে একেবারে গায়ে গায়ে লেগে আধ ইঞ্চি কি বড়জোর পৌনে এক ইঞ্চি ফিতের ভেতর অবস্থান নেয়। ফলে বার্তাটা যখন ট্র্যান্সমিট করা হয়, সবগুলো অক্ষর বা ডট-ড্যাশ ইত্যাদি ফোয়ারার মত ছিটকে বেরিয়ে এসে ইথারে মুহূর্তের জন্যে ফিসফিসানির সৃষ্টি করেই গায়েব হয়ে যায়, পৌঁছে যায় জায়গামত। স্কোয়ার্টে কোন প্যাটার্ন বা রিপিটেশন থাকে না, কাজেই এর মর্মোদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।

সেটা না পারলেও কোত্থেকে স্কোয়ার্ট ট্র্যান্সমিট করা হলো, বিয়ারিঙ আর ক্রসবিয়ারিঙের সাহায্যে জায়গাটা পিন-পয়েন্ট করতে সময় লাগে না কম্পিউটরের। কাজেই, কম্মটি সেরেই ঘটনাস্থল ছেড়ে তক্ষুণি সরে পড়তে হয় প্রেরককে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল। দশ মিনিট পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতাশ হলো স্থানীয় পুলিস। ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্টের

জনশূন্য এক রাস্তার পাশের ছোটখাট একটা ঝোপ ওটা। যার ত্রিসীমানার মধ্যেও কেউ নেই।

নিয়ম আনুযায়ী চেলটেনহ্যামের জিসিএইচকিউ হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছল ক্ল্যানডেস্টাইন মেসেজটা। ঝটপট কাজে লেগে পড়ল ওখানকার ঝানু চীফ অ্যানালিস্ট। স্লো মুভিঙ রেকর্ডারে নতুন করে টেপ করা হলো স্কোয়ার্ট, ফুটখানেক ফিতে জুড়ে জায়গা নিল ওটা। যাতে প্রতিটি অক্ষর ডট-ড্যাশ আলাদা আলাদা সনাক্ত করা সম্ভব হয় সহজেই। কিন্তু কোন লাভ হলো না। চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো মানুষ এবং কম্পিউটর ব্রেনের মিলিত শক্তি। ফল দাঁড়াল বড় একটা অশ্বডিম্ব।

'এ নিশ্চয়ই কোন স্লীপার ট্র্যান্সমিটার, স্যার,' সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের কাছে রিপোর্ট করল চীফ অ্যানালিস্ট। 'ডেড ছিল, অ্যাকটিভ করা হয়েছে। উত্তর মিডল্যাণ্ডের কোথাও আছে ওটা খুব সম্ভব। আমাদের স্পাই বন্ধুটি প্রতি শব্দের জন্যে একটা করে ফ্রেশ ওয়ান-টাইম প্যাড ব্যবহার করেছে।'

সিদ্ধান্ত নেয়া হলো 'স্পাই বন্ধুটি' যে চ্যানেলে স্কোয়ার্ট ট্র্যান্সমিট করেছে তার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। যদিও সবাই নিশ্চিত, ফের যদি ট্র্যান্সমিট করে সে নিঃসন্দেহে অন্য চ্যানেলের মাধ্যমে করবে। তবুও। পরদিন দুপুরের আগেই গোপন মাধ্যমে ঘটনার লিখিত পূর্ণ বিবরণ পৌঁছে গেল লণ্ডনে, বিএসএস চীফের টেবিলে।

এর অনেক আগে, স্থানীয় সময় রাত দুটো তেতাল্লিশে বার্তাটা রিসিভ করা হয়েছে মস্কোয়। ওর বক্তব্য ছিল, মার্টিন ফ্ল্যানারি জায়গামত প্রস্তুত। প্রথম 'চালান' পৌঁছার অপেক্ষায় আছে সে।

দুই

রোববার। বিকেল পাঁচটা। হিথ্রো এয়ারপোর্টে অবতরণ করল অ্যারোফ্লোটের বিশালবপু এক টুপোলভ। নিয়মিত সরাসরি মস্কো-লণ্ডন ফ্লাইট। এই সংস্থার প্রতিটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে একজন করে অফিসার থাকে কেজিবির 'এজিয়েন্ট'। এদের কাজ পাইলট-ক্রুদের ওপর নজর রাখা এবং বিদেশে অবস্থানরত কেজিবির 'রেসিডেন্টুরা'-দেরকে প্রয়োজনে মেসেজ বা 'আর কিছু' পৌঁছে দেয়া।

এই ফ্লাইটেও রয়েছে তেমনি একজন, ফার্স্ট অফিসার ভলকভ। ঘণ্টা দুয়েক পর বিমানটি ক্লোজ ডাউন করে রাতের মত হস্তান্তর করা হলো গ্রাউণ্ড ক্রুদের হাতে। কাল ফিরে যাবে ওটা মস্কো। তার প্রতিটি স্টাফ টার্মিন্যাল ভবনের ফ্লাইট-ক্রু এনট্রি পথে ভেতরে ঢুকল। সবার সঙ্গে একটা করে ব্যাগ এবং গ্রিপ। এছাড়াও কয়েকজনের কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝোলানো পোর্টেবল রেডিও ট্রানজিস্টরও রয়েছে।

ব্যাগ আর গ্রিপ চেক করে ছেড়ে দিল তাদের কাস্টমস। অন্যগুলোর মত ভলকভের সনি মডেল পোর্টেবল সেটটার দিকেও দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না কেউ। ওরা পশ্চিমা বিলাস সামগ্রীর ভক্ত, জানে হিথ্রো কাস্টমস। বেরিয়ে এসে নিজেদের বিমান সংস্থার অপেক্ষমাণ মিনিবাসে করে গ্রীন পার্ক হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো দলটা।

মস্কো ত্যাগের তিন ঘণ্টা আগে পোর্টেবলটা ফার্স্ট অফিসার ভলকভকে গছিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা ভালই জানে, এসবের ওপর খুব একটা নজর দেয় না হিথ্রো কাস্টমস। নিজের স্যুইটে পা রাখতে পেরে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ভলকভ। বড্ড টেনশনে ছিল এতক্ষণ। জিনিসটার ওপর নজর বোলাবার প্রবল ইচ্ছে সংবরণ করতে পারল না ফার্স্ট অফিসার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সে ওটা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেখে দিল বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারে।

দরজায় তালা মেরে পা চালাল ভলকভ বারের উদ্দেশে। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে পোর্টেবলটা কোথায় কাকে হস্তান্তর করতে হবে খুব ভাল জানে সে। কেবল জানে না, মস্কো ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে তাকে এয়ারপোর্টেই। প্ল্যান অরোরার স্বার্থে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে ফেলা হবে তাকে। ওটা যে আসলে 'চিরদিনের জন্যে', কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি এবং মেজর কিরলভ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

'আপনি!' দরজা খুলে বিস্মিত হলেন রবার্ট ফিলবি। মনে মনে প্রতি মুহূর্তে লোকটির ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। তার অবসান হলো খানিকটা চমকে ওঠার মধ্যে দিয়ে।

'ভেতরে আসতে পারি?' ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'শিওর শিওর।'

লক্ষ করল রানা, মুখ শুকনো শুকনো লাগছে লোকটির। কালো দাগ পড়েছে চোখের নিচে। দুশ্চিন্তায় নিশ্চয়ই। দরজা বন্ধ করে রানাকে পথ দেখিয়ে সিটিংরুমে নিয়ে এলেন ফিলবি। 'বসুন, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ।' কোটের পকেট থেকে পেট মোটা একটা খাম বের করল

মাসুদ রানা। ভেতর থেকে বেরল সাতটা টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। ওপরে ডি অ্যাঙ্গাসের ক্রিকেট খেলার ছবিসহ পিন আপ করা। মুখ তুলল ও। 'আপনাকে যে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলাম তা ফলো করেছেন?'

'কোন্টা? ও হ্যাঁ, করেছি।'

'যোগাযোগ হয়েছে এর মধ্যে অ্যাঙ্গাসের সাথে?'

'হ্যাঁ, দু'বার। টেলিফোনে কথা হয়েছে।'

মিথ্যে নয়, জানে মাসুদ রানা। প্রথমবার ফিলবির সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই তার টেলিফোনের প্রতিটি আউট গোয়িং ইন কামিং কল ট্যাপ করার ব্যবস্থা করেছিল ও। ওদের রেকর্ডে দু'বারের কথাই আছে। দুটোই ইন কামিং। ডি অ্যাঙ্গাস করেছিল। তেমন কোন আলাপ হয়নি দু'জনের। সংক্ষিপ্ত, সাঙ্কেতিক দু'চারটে বাক্য বিনিময় হয়েছে কেবল।

'ঠিক আছে। এগুলো পড়ুন,' কাগজগুলো এগিয়ে দিল মাসুদ রানা।

'কি এসব?'

'পড়ে দেখুন,' নির্দেশের সুরে বলল ও।

ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলেন খানিক রবার্ট ফিলবি। তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটা উঁচু করে ধরে পড়তে শুরু করলেন। প্রথম পাতার মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়া হতে মুখ তুললেন। 'আপনি দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন?'

দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে পলকহীন চোখে তাঁকে দেখছে রানা। 'কীপ রীডিং, প্লীজ।'

আবার পড়ায় মন দিলেন ফিলবি। প্রথম দু'পাতা খুব দ্রুত পড়ে গেলেন। পরের প্রতিটি পাতায় কয়েকবার করে হোঁচট খেল তাঁর দৃষ্টি। কোন কোন জায়গা দু'বার তিনবার করেও পড়লেন। শ্বাস গ্রহণ বর্জনের

ভারি আওয়াজ ব্যাহত হলো কয়েকবার। এক সময় শেষ হলো পড়া। প্রায় এক মিনিট ধরে ছবিটা দেখলেন আবার তিনি। রক্ত সরে গিয়ে ছাইয়ের মত হয়ে গেছে ততক্ষণে চেহারা।

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন রবার্ট ফিলবি। দেহ অল্প অল্প দোল খাচ্ছে সামনে পিছনে। 'ওহ্, গড! এ আমি কি করেছি!'

'আ হেল্ অভ আ লট অভ ড্যামেজ, অ্যাকচুয়ালি।'

ভদ্রলোক নিজের বুদ্ধির দৈন্য অনুধাবন করতে পারছেন এখন হাড়ে হাড়ে, ভাবল মাসুদ রানা। চোখেমুখে তার চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চেহারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, ঝোড়ো কাকের মত দেখতে হয়েছে। বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে দেখতে দেখতে। মুখ তুললেন রবার্ট ফিলবি। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, 'এমন কোন উপায় কি আছে যাতে এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যায়, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'যারা আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করাতে চাইছিল, আমি প্রিটোরিয়া থেকে ফিরে আসার পর তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। একসঙ্গে এতজনকে সামাল দিতে গিয়ে ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছি আমি।'

'মিস্টার রানা,' প্রায় মিনতি ফুটল ফিলবির কণ্ঠে। 'আপনি যা করতে বলবেন, তাই করব আমি। যে কোন কাজ…'

'তিনটে কাজ করতে হবে আপনাকে আসলে,' বাধা দিয়ে বলল মাসুদ রানা।

'আমি প্রস্তুত। আই মীন ইট। যে-কোন কাজ, মিস্টার রানা।'

'ওয়েল। নাম্বার ওয়ান, নিয়মিত অফিস করতে থাকুন। সব রুটিন মাফিক চলতে হবে। শান্ত সারফেসে একটিও যেন বুদ্বুদ না ওঠে। নাম্বার টু, লেডি ফেডোরা যাতে আরও মাসখানেক শেফিল্ডে থাকেন, তা নিশ্চিত

করতে হবে যে ভাবে পারেন। কাল রাতে কয়েকজন লোক আসবে বিএসএস থেকে। ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্টের কাজ করবে ওরা। ডি অ্যাঙ্গাসের হাতে আপনি কোন্ কোন্ ডকুমেন্ট তুলে দিয়েছেন, তার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে ওদের। মনে রাখবেন, প্রতিটির হদিস চাই আমি। ডিটেল জানাবেন। একটি দাঁড়ি কমাও যদি উল্লেখ করতে ভুল করেন, সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেব আমি।'

'ভুল হবে না,' ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন রবার্ট ফিলবি। 'একটুও ভুল হবে না। প্রত্যেকটি ডট-কমা মনে আছে আমার।'

'দেখা যাবে।'

'ইয়ে, তিনটে কাজ বলেছিলেন আপনি।'

'হ্যাঁ। মাঝে মধ্যে ডকুমেন্ট হস্তান্তর করবেন ডি অ্যাঙ্গাসকে। আপনার ইউজুয়াল চ্যানেলে।'

'কিসের ডকুমেন্ট?'

'সময়মত তৈরি করে দেয়া হবে।'

'ডিজইনফর্মেশন?'

'এগজ্যাক্টলি। নিজের দেশের প্রচুর ক্ষতি করেছেন, মিস্টার ফিলবি। এবার ওদের কিছু ক্ষতি করুন। মনে রাখবেন, অ্যাঙ্গাসের মুখোমুখি হওয়া চলবে না এখনই। আপনার চেহারা দেখলেই বিপদ টের পেয়ে যাবে ও, হয়তো সটকে পড়বে। সে ক্ষেত্রে মাঝখান থেকে আপনি ফেঁসে যাবেন।'

'কিন্তু ও যদি দেখা করতে চায়?'

'যে-কোন ব্যস্ততার অজুহাতে কাটিয়ে দেবেন। আমি না বলা পর্যন্ত দেখা করা চলবে না।'

পাঁচ মিনিট পর ফন্টেনয় হাউস থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

সকাল সাড়ে নয়টা। হিথ্রোর এয়ার লাইনার স্টাফদের ক্যান্টিনে প্রচুর

সময় নিয়ে নাশতা সারল অ্যারোফ্লোটের ফার্স্ট অফিসার ভলকভ। তারপর দু'কাপ কালো কফি এবং দুটো সিগারেট ধ্বংস করল। ঠিক পৌনে দশটায় মেনস টয়লেটে এসে ঢুকল সে। আগে একবার এসে দেখে গেছে সে ঠিক কোন কিউবিক্‌ল্‌-এ ঢুকতে হবে তাকে। একদম শেষ মাথার দ্বিতীয়টা। চেক করে দেখেছে, প্রথমটির দরজা কথা মত লক করা আছে।

নির্দিষ্ট কিউবিক্‌ল্‌-এ ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ফার্স্ট অফিসার। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ছয় শব্দের একটি প্রশ্ন লিখল। তারপর ঝুঁকে ওটা পার্টিশনের নিচ দিয়ে ঠেলে দিল প্রথমটির ভেতরে। একটা হাত তুলে নিল কার্ডটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিল আবার। উল্টোপিঠে প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে।

সন্তুষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাল ভলকভ, ঠিকই আছে। এবার সনি পোর্টেবলটা আলতো করে ওপাশে পাঠিয়ে দিল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। বাইরে ইউরিনালে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ, ছর ছর শব্দ আসছে। কমোড ফ্লাশ করল ভলকভ। বেরিয়ে এসে বেসিনের সামনে দাঁড়াল। ইউরিনাল ব্যবহারকারীর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া চালিয়ে গেল সে। তারপর বেরিয়ে এল তার পিছন পিছন।

কাস্টমস ব্যারিয়ার পেরিয়ে এসে নিজেদের বিমানে উঠল ফার্স্ট অফিসার আর সবার সঙ্গে। কাঁধে যে তার পোর্টেবলটা নেই, চোখেই পড়েনি কাস্টমসের। ওদিকে তার সঙ্গীরা ভাবল জিনিসটা নিশ্চয়ই তার গ্রিপে রয়েছে। ঠিক একটায় মাটি ত্যাগ করল অ্যারোফ্লোটের টুপোলভ। মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ ওরফে মার্টিন ফ্ল্যানারির প্রথম চালান নিরাপদেই হস্তান্তর করে যেতে পেরেছে ভলকভ।

পরদিন রাত আটটায় বিএসএস আর ডিফেন্স মিনিস্ট্রির অ্যানালিস্টদের

একটি যৌথ ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট টীম বেলগ্রাভিয়া রোডের ফন্টেনয় হাউসে প্রবেশ করল। প্রস্তুত ছিলেন রবার্ট ফিলবি। শুরু হলো বৈঠক। প্রথম কাজ সনাক্তকরণ। যে সব ডকুমেন্ট এ পর্যন্ত মস্কো গেছে অ্যাঙ্গাসের হাত দিয়ে, সেগুলো চিহ্নিত করা। প্রায় সারা রাত ধরে চলল বৈঠক।

মিনিস্ট্রির ওরা ডকুমেন্ট উইথড্রআল আর রিটার্নের রেজিস্ট্রি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ওতে কবে কোন সেকশন থেকে কি কি ডকুমেন্ট নিজ ডেস্কে আনিয়েছেন ফিলবি, কবে তা ফেরত দিয়েছেন, সব রেকর্ড আছে। ভদ্রলোক এক-আধটার কথা 'ভুলে' গিয়ে থাকলে তা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে আনা হয়েছে ওটা। সঙ্গে ডকুমেন্টগুলোর একটা করে ফটোকপিও। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। দেখা গেল কিছুই ভোলেননি ফিলবি, প্রতিটির কথাই মনে আছে।

এর পরদিন বেশ কিছু 'ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট' তৈরির কাজে লেগে পড়ল যৌথ দলটি। উপযুক্ত সময়ে ডি অ্যাঙ্গাসের হাত হয়ে মস্কো পৌঁছুবে ওগুলো।

ফিনিয়েস্টন কী। গ্লাসগো। সোভিয়েত কার্গো শিপ আকাডেমিক কোমারভ বাঁধা আছে জেটিতে। আজই দুপুরে পৌঁছেছে ওটা মালামাল নিয়ে। সন্ধে পর্যন্ত পোর্ট অথরিটির হেভি ক্রেনগুলো আনলোডিং চালিয়েছে বিরতিহীন। আপাতত বন্ধ কাজ, কাল ফের শুরু হবে।

এখানে কাস্টমস বা ইমিগ্রেশন চেকিঙের ঝামেলা নেই। বিদেশী ক্রুরা ইচ্ছে করলেই নিজ জাহাজ ত্যাগ করতে পারে, ঘোরাঘুরি করতে পারে শহরে। রাত বারোটা। আকাডেমিক কোমারভের ডেকহ্যাণ্ড আঁদ্রেই পাভলভ গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের মাথায় এসে দাঁড়াল। সতর্ক চোখে ডানে বাঁয়ে চোখ বোলাতে লাগল সে।

মানুষজন আছে এখনও কিছু, তবে দূরে দূরে। কেউ নজর রাখছে না ওদের ওপর। তবু ভাল করে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কয়েক মিনিট ব্যয় করল ডেকহ্যাও। তারপর তর তর করে নেমে এল জেটিতে। বন্দর সীমানা গেটের বাইরেই মুখোমুখি একটি বার, বেটি'স বার। নিয়ম অনুযায়ী ঠিক বারোটায় বন্ধ হয়ে গেছে ওটার দরজা। কিন্তু বেশ কিছু মাতাল নাবিক হল্লা করছে সামনে দাঁড়িয়ে, আরও পান করতে চায়। ঠিক ঘড়ি ধরে বার বন্ধ করে দেয়াটা পছন্দ হয়নি তাদের।

দূর থেকে জটলাটার পাশ কাটিয়ে ফিনিয়েস্টন স্ট্রীটে এসে পড়ল পাভলভ। কর্ড ট্রাউজারস, গোল গলা সোয়েটার আর অ্যানোরাক পরেছে সে। পায়ে ভারী জুতো। পাভলভের চেহারা-সুরত নিতান্তই সাধারণ। বাঁ বগলের নিচে একটা ছোট ক্যানভাসের গানি স্যাক ঝুলছে তার। কাঁধের ওপর, ঘাড়ের কাছে ড্রস্ট্রিং দিয়ে বাঁধা, যাতে পড়ে না যায়।

ক্লাইডসাইড এক্সপ্রেসওয়ে পেরিয়ে এসে আরজিল স্ট্রীটে পৌঁছল লোকটা। বাঁয়ে ঘুরে জোর পা চালাল প্যাট্রিক ক্রসের উদ্দেশে। জীবনে কোনদিন এ শহরে আসেনি সে, কাজেই রাস্তাঘাট চেনার প্রশ্নই আসে না। সঙ্গে সিটি ম্যাপও নেই পাভলভের। তবু সঠিক পথেই এগোচ্ছে সে। কারণ দেশ ত্যাগ করার আগে কম্পিউটরের পর্দায় কোন পথে কোন পর্যন্ত যেতে হবে ভাল করে দেখে আত্মস্থ করে নিয়ে এসেছে সে।

এখন আর কোনদিকে তাকাবার গরজ দেখা যাচ্ছে না পাভলভের ভেতর। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। কদাচিৎ এক-আধটা গাড়ি চোখে পড়ে। অতএব নিশ্চিন্ত মনে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে ডেকহ্যাও গন্তব্যের উদ্দেশে। প্যাট্রিক ক্রস ধরে পুরো এক মাইল উত্তরে এগোল সে। ডানে বাঁক নিয়ে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রোডে পৌঁছল।

চট করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল আঁদ্রেই পাভলভ। একটা

ত্রিশ। এখনও পুরো আধঘণ্টা সময় হাতে আছে, অথচ গন্তব্যে পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। আবার ডানে চলল সে। পণ্ড হোটেল বাঁয়ে রেখে বোটিং লেকের তীর ধরে হাঁটছে। হঠাৎ করেই জায়গাটা চোখে পড়ল পাভলভের। আলো ঝলমলে এক বিপি সার্ভিস স্টেশন। ওই পর্যন্তই তার দৌড়। আর বড়জোর দুশো গজ, তারপরই মুক্তি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল আঁদ্রেই, এই সময় আবছা কাঠামোগুলো চোখে পড়ল। ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠল সে। হোটেল এবং সার্ভিস স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় অন্ধকার এক বাস স্টপের যাত্রী ছাউনির নিচে বসে আছে ওরা। পাঁচজন। দশাসই ফিগার একেকজনের। সব ক'টা মাতাল, দেখেই টের পেল ডেকহ্যাণ্ড। গতি কমে এসেছে তার আপনাআপনি। এগোবে না কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

এদেশের কোথাও কোথাও এদের বলা হয় 'স্কিনহেডস্' অথবা 'পাঙ্কস্'। তবে গ্লাসগোয় বলা হয় 'নেডস্'। রাস্তা অতিক্রম করবে কি না, ভাবল একবার পাভলভ। ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না তার। একভাবে ওকেই দেখছে ব্যাটারা। হঠাৎ করেই ওদের একজন হাঁক ছাড়ল তার উদ্দেশে। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে দল বেঁধে বেরিয়ে এল সবাই ছাউনি ছেড়ে। ঘিরে ধরল পাভলভকে।

ওদের আকার এবং রক্ত জমা লাল চোখের অস্থির চাউনি আতঙ্কিত করে তুলল লোকটিকে। একজন কি যেন জিজ্ঞেস করল জড়ানো কণ্ঠে, কিছুই বুঝল না পাভলভ। কাজ চালিয়ে নেয়ার মত ইয়েস নো ভেরি গুড জাতীয় দু'চারটে ইংরেজি জানে সে ঠিকই, কিন্তু একে জড়ানো কণ্ঠ, তারওপর গ্লাসগোর বাজে অ্যাকসেন্ট, একটা শব্দও পরিচিত মনে হলো না তার। বেকুবের মত এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল অসহায় দৃষ্টিতে

উত্তর না পেয়ে খেপে গেল মাতাল। দুহাতে সবলে জাপটে ধরল

তাকে। কানের কাছে বাজখাঁই গলায় আবারও একই প্রশ্ন করল। 'হোয়া' হা' ইয়া গট ইন ইয়া উয়ী স্যাক, দেন?'

জোরে জোরে মাথা দোলাল পাভলভ। লোকটিকে বোঝাতে চাইল তার বক্তব্য বুঝতে পারেনি সে। একই সঙ্গে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মোড়ামুড়ি শুরু করল। পর মুহূর্তে বৃষ্টির মত এলোপাতাড়ি কিল ঘুসি আর লাথির তোড়ে মুখ থুবড়ে পড়ল আঁদ্রেই পাভলভ। শক্ত রাস্তায় ভীষণ জোরে নাক ঠুকে গেল তার। সমানে চেঁচাচ্ছে নেড়ের দল আর নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছে তাকে। ওরই মাঝে কেউ তার গানি স্যাকটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, টের পেয়ে গেল আঁদ্রেই কাঁধের পেশীতে ড্রস্ট্রিঙের টান বেড়ে যেতে।

মরিয়া হয়ে উঠল ডেকহ্যাণ্ড। জান যায় যাক, ওটা ছিনিয়ে নিতে দেবে না সে। দু'হাতে বুকের কাছে ব্যাগটা চেপে ধরল সে, বহুকষ্টে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল মাটি কামড়ে। পিছন থেকে কিডনি আর মাথার ওপর সমানে লাথি হেঁকে চলেছে লোকগুলো, থামাথামির লক্ষণ নেই। নীরবে প্রতিটি মার হজম করতে লাগল পাভলভ। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মাথার ভেতর মগজ বিস্ফোরিত হচ্ছে যেন প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে তার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা মুখ।

ঘটনাস্থলের সামান্য দূরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের কলোনি,

ডেভনশায়ার টেরেস। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ভবন। ওর একটির চারতলায় থাকেন নিঃসন্তান, বিপত্নীক মিস্টার বেরেনসন। বাতের ব্যথায় ঘুম হয় না রাতে। নিচ থেকে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসায় দ্রুত বিছানা ত্যাগ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ কপালে তুলে কয়েক সেকেণ্ড ব্যাপারটা লক্ষ করলেন, তারপর বাতের ব্যথা

ভুলে ছুটে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন।

কাছাকাছিই ছিল একটা পেট্রল কার। স্টেশন-ইন-চার্জের নির্দেশ পেয়ে ঝড়ের বেগে এসে হাজির হলো ওটা জায়গামত। সাইরেনের আওয়াজ আর হেড়লাইটের আলো দেখে গানি স্যাকের আশা ছেড়ে দিল নেড়ের দল। নিঃসাড় আঁদ্রেইকে ছেড়ে তীরবেগে ছুট লাগাল অন্ধকার বোটিং লেকের দিকে। অজ্ঞান দেহটিকে রক্তের নদীতে ভাসতে দেখে ওদের ধাওয়া করার চিন্তা বাদ দিল কারের দুই আরোহী, সার্জেন্ট হিউই এবং সার্জেন্ট ব্রায়ান।

পাভলভের পালস্ পরীক্ষা করল হিউই এক মুহূর্ত। 'এক্ষুণি অ্যাম্বুলেন্স ডাকো, ব্রায়ান!'

ওয়েস্টার্ন ইনফার্মারি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছল চার মিনিটের মধ্যে। পাভলভের দেহটা ততক্ষণে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে হিউই। কাঁধ থেকে খুলে নিয়েছে গানি স্যাক। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো তাকে। 'তুমি ওর সঙ্গে যাও!' পেট্রল কার থেকে চেঁচিয়ে বলল ব্রায়ান। 'আমি আসছি পিছন পিছন।'

এবার আরও দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছল অ্যাম্বুলেন্স। ট্রলি ঠেলে দু'তিনটে সুইং ডোর, করিডর পেরিয়ে ভবনের পিছনদিকের এমার্জেন্সি অ্যাডমিশনে ঢোকানো হলো আঁদ্রেইকে।

'আমি ভেতরে চললাম,' ব্রায়ানকে বলল হিউই। 'তুমি থাকো এখানে। এর ভর্তি ফরমটা পূরণ করে ফেলো।'

'ওকে।'

গানি স্যাক দোলাতে-দোলাতে করিডর ধরে ভেতরে চলল সার্জেন্ট হিউই। ব্যাগের ভেতর কি আছে দেখা হয়নি এখনও। তা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথাও নেই তার। ক্যাজুয়ালটিতে পা রাখল সার্জেন্ট। দু'পাশে পর্দা

ঢাকা বারোটা রুম। একটা ডিউটি নার্সের অফিস, এগারোটা এক্জামিনেশন রুম। জায়গাটা হাসপাতালের রিয়ার এন্ট্রান্সের একেবারে কাছে। ওদিকে সামনের পোর্টারস ডেস্কে বসে পড়ল ব্রায়ান। আঁদ্রেই পাভলভের ভর্তির ফরম তৈরি করার জন্যে।

এদিকে ট্রলির পাশে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল হিউই। কয়েকজন নার্স ব্যস্ত ট্রলি ঘিরে। লোকটা আছে না গেছে বোঝা যাচ্ছে না। নাইট শিফটের ডিউটিতে আছে অল্পবয়সী পাকিস্তানি এক ডাক্তার। লম্বা সময় নিয়ে ডেকহ্যাণ্ডের নাড়ি-নক্ষত্র পরীক্ষা করল সে। তারপর মাথা এক্স-রে করার নির্দেশ দিয়ে ছুটল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আরেকজনকে দেখতে।

কিন্তু যন্ত্রটা এ মুহূর্তে ব্যস্ত, ওয়ার্ড সিস্টারের টেলিফোনের উত্তরে জানাল এক্স-রে ইউনিট। কাজ শেষ হলে জানানো হবে সিস্টারকে। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। নিজের জন্যে কফির পানি চড়াল ওয়ার্ড নার্স। আরেক জুনিয়র নার্স আঁদ্রেইর রক্তাক্ত অ্যানোরাক খুলে এনে রাখল তার টেবিলের ওপর।

'কফি চলবে?' হিউইকে প্রশ্ন করল সিস্টার।

'খুব চলবে। ধন্যবাদ।' অ্যানোরাকের পকেট হাতাতে শুরু করল সার্জেন্ট। দ্বিতীয় পকেট থেকে বের হলো একটা সীম্যানস পে-বুক। ভেতরে মৃতপ্রায় লোকটির ছবি সাঁটা। রুশ এবং ফরাসী ভাষায় লেখা বইটা। তবে ফরাসী অংশে রোমান হরফে লেখা ডেকহ্যাণ্ডের নামটা রয়েছে। ওটা পড়ল সে। আর কিছুই বুঝল না।

'কে লোকটা?' সার্জেন্টের সামনে কফির কাপ রেখে জানতে চাইল সিস্টার।

'সীম্যান,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল হিউই। 'রাশান।' লোকটা এখানকার

কেউ হলে কোন সমস্যা ছিল না। একে বিদেশী, তাও আবার রাশিয়ান। তুলোধোনা হয়েছে নেডদের হাতে। ঝামেলায়ই পড়া গেল, তিক্ত মনে ভাবল সার্জেন্ট। এ গেরো থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। এবার গানি স্যাকে হাত ঢোকাল সে।

ভেতরে পুরু উলের একটা সোয়েটার। ওটা দিয়ে শক্ত কিছু একটা মুড়ে রাখা হয়েছে। জিনিসটা বের করল সার্জেন্ট—একটা টোব্যাকো টিন। পেঁচিয়ে ওটার মুখ খুলল। ভেতরে ঠেসে ঢোকানো আছে এক দলা কটন উল। টিনটা উপুড় করে ঝাঁকি দিল হিউই। সড়াৎ করে বেরিয়ে এল কটন উল, টেবিলের ওপর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ তুলে তিনটে ধাতব ডিস্ক আছড়ে পড়ল। দুটো অ্যালুমিনিয়াম এবং একটা হালকা ধূসর রঙের। তিনটেই দুই ইঞ্চি ডায়ার। কি এগুলো? ভাবল সার্জেন্ট। উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর যেমন ছিল তেমনি ভরে রাখল টিনের মত। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল হিউই। এখনই ডিভিশনে ফোন করা উচিত, ভাবল সে। নইলে পরে ধাতানি খেতে হতে পারে। যা-তা নয়, রাশিয়ান নাবিক লোকটা। গুরুত্ব দেয়া দরকার। 'আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'শিওর,' মাথা ঝাঁকাল ওয়ার্ড সিস্টার। বেরিয়ে গেল রুম ছেড়ে।

রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাতে আরম্ভ করল সার্জেন্ট। এই সময় হঠাৎ করেই জ্ঞান ফিরে পেল আঁদ্রেই পাভলভ। কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, মাথার ভেতর কেমন একটা ধোঁয়াটে ভাব। সব কিছু দুলছে। বহু কষ্টে মাথা তুলল সে ইঞ্চি দুয়েক। কালো ইউনিফর্ম পরা হিউইকে দেখেই কলজে লাফিয়ে উঠল। পুলিস!

তার ডান কনুইয়ের কাছে টেবিলের ওপর নিজের পে-বুক আর

টোব্যাকো টিনটা দেখতে পেয়ে চক্কর দিয়ে উঠল পাভলভের মাথার মধ্যে। সর্বনাশ! ভেতরের জিনিসগুলো কি দেখেছে লোকটা? চিনে ফেলেছে ওগুলো কি? সেই খবরই জানাতে যাচ্ছে ফোন করে? কোন এক অজানা শক্তি যেন ধাক্কা মেরে ট্রলি থেকে নামিয়ে দিল পাভলভকে।

কাঁধে কারও শক্ত গুঁতো খেয়ে চমকে উঠল সার্জেন্ট, পাশে তাকাল। ততক্ষণে টোব্যাকো টিনটা ঝটকা মেরে তুলে নিয়েছে আঁদ্রেই। 'হেই, ম্যান···।' রিসিভার ফেলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল হিউই। মাথায় আঘাত পেয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে হয়তো লোকটা, ভেবে তাকে শান্ত করার জন্যে জড়িয়ে ধরল পিছন থেকে। 'শান্ত হও, ব্রাদার। কোন ভয় নেই।'

কিন্তু শান্ত হওয়ার কোন লক্ষণ নেই পাভলভের মধ্যে। গায়ের জোরে টানা হ্যাঁচড়া করে নিজেকে মুক্ত করে নিল সে। জোর খাটাতে গিয়েই হঠাৎ করে টিনটা ছুটে গেল তার হাত থেকে। গড়িয়ে চলে গেল নাগালের বাইরে। সেদিকে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত পাভলভ, তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল করিডর ধরে।

'হেই, ম্যান! কাম ব্যাক, কাম ব্যাক!' সার্জেন্টও ছুটল পাভলভের পিছন পিছন।

সামনেই এক্স-রে রুম। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাস্টি ইনগ্রাম। লোকটি মাঝবয়সী কারখানা শ্রমিক। ডিউটির সময় ছাড়া বাকি সময় মদে বুঁদ হয়ে থাকা একমাত্র নেশা তার। আজ তার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল। তাই সকাল থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত মদ গিলেছে বারে বসে। পকেট খালি করে বাসায় ফেরার পথে একটা ল্যাম্পপোস্ট আচমকা অন্যায় ভাবে পথরোধ করে দাঁড়ায় তার। প্রথমে নরম সুরেই তাকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল রাস্টি। কাজ হলো না, বরং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আরও কাছে এসে দাঁড়াল ওটা। আত্মরক্ষার্থে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাস্টি। ওটার কি হাল হয়েছে জানার সুযোগ হয়নি, কারণ

লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই পুলিস তাকে পাকড়াও করেছে। বলে কি না, রাস্টি ইনগ্রামের ডান হাত ভেঙে গেছে।

তার হাজারো আপত্তি কানেই তোলেনি পুলিস, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসেছে হাসপাতালে। ওদের ওপর তাই বড় রাগ ইনগ্রামের। আধা মাতাল সে এখনও। এক্স-রে সেরে ডাক্তার তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলেছে বলে করিডরে বসার জন্যে এসেছে। এই সময় ধুম্ ধাম্ পায়ের শব্দে মুখ তুলল সে। চোখ পড়ল আতঙ্কিত রক্তাক্ত পাভলভের ওপর। এবং পরক্ষণেই সার্জেন্ট হিউইর ওপর।

কালো পোশাকের ওপর রাগটা চেগিয়ে উঠল রাস্টি ইনগ্রামের। ওই লোকটিকেও নিশ্চয়ই ওর মত…ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই ঝড়ের গতিতে ইনগ্রামকে পাশ কাটাল পাভলভ। তার ঠিক চার ফুট পিছনেই সার্জেন্ট হিউই। আস্তে করে ডান পা-টা বাড়িয়ে দিল ইনগ্রাম। ল্যাঙ খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ল হিউইর ভারী দেহটা।

'ইউ স্টুপিড উয়ী বাগার!' প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল হিউই, পরক্ষণেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল ফ্লোরে। সড় সড় করে ফুট কয়েক পিছলে এগিয়ে গেল দেহটা। মেঝে কেঁপে উঠতে পিছনে তাকাল আঁদ্রেই এক পলক, বাড়িয়ে দিল ছোটার গতি।

রাগে গা জ্বলে গেলেও কিছু করার নেই হিউইর। আঁদ্রেই ততক্ষণে প্রায় দশ গজ পিছনে ফেলে দিয়েছে তাকে। ইনগ্রামের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলার ভঙ্গি করল সে, তারপর আবার ছুটল ডেকহ্যাণ্ডের পিছনে। করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছেই পাশাপাশি দুটো এলিভেটরের ওপর চোখ পড়ল পাভলভের। একটার দরজা আধখোলা, বন্ধ হতে শুরু করেছে, ভেতরে নেই কেউ।

দিশে না পেয়ে সেদিকেই ছুটল ডেকহ্যাণ্ড। একেবারে শেষ মুহূর্তে কাত হয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল এলিভেটরে। বন্ধ দরজার গায়ে হিউইর

দমাদম কিলের আওয়াজ উঠছে, অনবরত চেঁচাচ্ছে লোকটা। দুলে উঠে ওপরদিক রওনা হলো এলিভেটর। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল আঁদ্রেই।

ওদিকে এলিভেটর শ্যাফটের পিছনেই স্টেয়ারওয়েল। ক্যাঙ্গারুর মত একেক লাফে চারটে করে ধাপ টপকে ওপরে উঠতে শুরু করল সার্জেন্ট হিউই। প্রতি ফ্লোরেই ছুটে ছুটে এসে এলিভেটর ইণ্ডিকেটরের ওপর চোখ বোলাচ্ছে। কোন ফ্লোরে আছে ওটা, নিজে কতখানি পিছিয়ে পড়েছে বোঝার জন্যে। কোথাও না থেমে সোজা টপ ফ্লোরে, দশতলায় উঠে গেল এলিভেটর। ছুটতে ছুটতে জিভ বেরিয়ে পড়ল হিউইর। দম ফেলছে ঝড়ের বেগে।

শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল সে। জায়গামত পৌঁছে দেখল দাঁড়িয়ে রয়েছে এলিভেটর। দরজা খোলা, কেউ নেই ভেতরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক হাঁপাল সে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আঁদ্রেইর খোঁজে। দীর্ঘ করিডর ফাঁকা। কোথাও কোন চিহ্ন নেই তার। ছুটল সার্জেন্ট। দশতলার প্রতিটি ওয়ার্ড, কেবিন খুঁজে দেখল, নেই সে। কেউ কিছু বলতে পারল না।

হঠাৎ কি মনে হতে আবার স্টেয়ারওয়েলের দিকে ছুটল হিউই। তিন-চার লাফে উঠে এল ছাতে। দরজা পেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠল সে। তারা জ্বলা আকাশের গায়ে ছায়া পড়েছে পাভলভের। উত্তর দিকের প্যারাপেটে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে।

'আঁদ্রেই!' গলার স্বর আটকে গেল হিউইর। 'পাভেল! নেমে এসো, ভাই। কোন ভয় নেই তোমার। নেমে এসো, তোমার চিকিৎসা দরকার।'

পা বাড়াল সে। অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। নিচের ঘরবাড়ি, রাস্তার আলোয় আঁদ্রেইর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

নিজের শূন্য দু'হাত তুলে দেখাল সার্জেন্ট। 'এই দেখো, কোন অস্ত্র নেই আমার হাতে, আঁদ্রেই। কোন ভয় নেই তোমার। প্লীজ, নেমে এসো। পা পিছলে গেলে...।'

সার্জেন্ট বিশ ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে দেখে কিছুটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল পাভলভ। দ্রুত একবার নিচে তাকাল। দম নিল লম্বা করে। চোখ বুজল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে। আহাম্মক হয়ে গেল সার্জেন্ট। কয়েক সেকেণ্ড বিশ্বাসই করে উঠতে পারল না যা দেখল তা মিথ্যে নয়। সত্যি। নিচের স্টাফ কার পার্কে পতনের ভারী আওয়াজ উঠল।

চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল সার্জেন্টের। 'হা ঈশ্বর! মরে গেছি!' কাঁপা হাতে বেল্টে ঝোলানো পারসোন্যাল রেডিওটা বের করল সে।

বিপি সার্ভিস স্টেশনের একশো গজ ওপাশে বিশাল বিএমডব্লিউর ওপর মূর্তির মত বসে আছে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। একটা বড় ঝোপের আড়ালে। একে জায়গাটা অন্ধকার, তারওপর কালো মোটরসাইকেল লেদার পরে থাকায় ভাল করে তাকালেও কেউ দেখতে পাবে না তাতায়েভকে।

ঘড়ি দেখল সে। তিনটে। দুটোয় পৌঁছার কথা তার দ্বিতীয় চালান। কিন্তু এল না। আর অপেক্ষা করারও উপায় নেই। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরও যদি চালান না পৌঁছায়, তো সে স্থান ছেড়ে সরে পড়ার নির্দেশ আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মেজর। আবার মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাকে। জানাতে হবে ব্যাক-আপ কুরিয়ার পাঠাবার কথা। এঞ্জিন স্টার্ট দিল তাতায়েভ।

*

ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে 'প্রতিবেশীকে' (স্থানীয় ভাষায় সহকারী) ছুটে আসতে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট ব্রায়ান। 'কি ব্যাপার!' হিউইর ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে। 'লোকটার পরিচয় জানা গেল?'

'লোকটা...লোকটা ছিল সীম্যান, রাশান।'

'এই রে! বেঁচে আছে, না...।'

'নেই,' দ্রুত মাথা দোলাল হিউই। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে বুঝি। 'লোকটা আত্মহত্যা করেছে, ব্রায়ান। লাফিয়ে পড়েছে ছাদ থেকে।'

অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে প্রতিবেশীর দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ ব্রায়ান। 'বলো কি!' পরক্ষণে বিস্ময় আর অবিশ্বাসের জায়গা দখল করল পুলিসী ট্রেনিং। সে জানে, যখনই কোন গণ্ডগোল দেখা দেবে, আগে নিজের পিঠ আর চাকরি বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা যে করেই হোক। প্রতিটি পা ফেলতে হবে প্রসিডিওর অনুযায়ী। কোন কাউবয় ট্যাকটিক নয়। নয় কোন অতি স্মার্ট চালাকি। 'ডিভিশনে যোগাযোগ করেছ?'

'আয়ি,' মাথা ঝাঁকাল হিউই।

'চলো, ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাক।'

তিন

বাঁ হাতের চেটোয় মাথা রেখে প্রায় শুয়ে আছে গিলটি মিয়া টেবিলের ওপর। কাগজে আঁকিবুকি করছে। নাকি সুরে চাপা কণ্ঠে গাইছে, 'মাঁটির পিঁঞ্জিরার মাঁজে-এ-এ...।'

রানা এজেন্সির ফ্রন্ট অফিস এটা। বেলা তিনটে। ব্যক্তিগত কাজে রানার পি.এ মেয়েটি ছুটি নিয়েছে আজ আধবেলার জন্যে। গিলটি মিয়া সামলাচ্ছে তার কাজ। 'হাঁছুন রাঁজার মঁন মঁয়না' পর্যন্ত পৌঁছেছে সে, এমন সময় নক হলো দরজায়। বিরক্ত মুখে ওই অবস্থায়ই ঘুরে তাকাল গিলটি মিয়া। 'ক্যা?'

খুলে গেল দরজা দড়াম করে। কেঁপে উঠল পার্টেক্স পার্টিশন। সেই সঙ্গে গিলটি মিয়াও। পরক্ষণেই চমকে গেল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটিকে দেখে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাড-মিনিস্ট্রেটর, সোহেল আহমেদ। বাঘের দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে সোহেল। অসাড় আঙুলের ফাঁক গলে কলমটা খসে পড়ল গিলটি মিয়ার। স্প্রিঙের মত তড়াক করে আসন ছাড়ল সে, সালাম করার ভঙ্গিতে কপালে উঠে গেছে ডান হাত।

এই 'হাত কাটা সায়েবকে' যমের চেয়েও বেশি ভয় করে সে। তার চোখের দিকে তাকালে হিম হয়ে যায় বুকের ভেতরটা। কী চাউনি! ঠিক

যেন শামসুদ্দীন দারোগা। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে জ্বর উঠে যায় গতরে। 'স্যা...স্যার, আপনি?'

'রানা কোথায়?' হুঙ্কার ছাড়ল সোহেল।

'ওপরে, স্যার। ঘুমুচ্চেন।'

ভেংচি কাটল সোহেল, 'বা বা বা! ঘুমুচ্চেন! একজন ভর দুপুরে ঘুমুচ্ছেন, আরেকজন শুয়ে শুয়ে গলা সাধছেন। ভালই চালাচ্ছ তোমরা অফিস। দাঁড়াও, বার করছি তোমাদের...।' ঘুরে দাঁড়াল সোহেল আহমেদ। পা চালাল সিঁড়ির দিকে।

রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া, পা বাড়াতে গেল পিছন পিছন। কিন্তু সোহেলকে ঘাড় ফেরাতে দেখে থেমে পড়ল। 'তুমি কেন আসছ?'

'না, স্যার,' এক প্পা পিছাল গিলটি মিয়া। 'আস্চি নে। আসবো কোতায়?' সুড়ৎ করে রুমে সেঁধিয়ে গেল সে।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ হাসি ঠেকিয়ে রেখেছিল সোহেল। আর পারল না। হাসতে হাসতে ওপরে চলল সে। ওদিকে দিবাস্বপ্নে বিভোর মাসুদ রানা। ধানমণ্ডি লেকে মাছ ধরছে ও আর সোহেল। টোপ ফেলামাত্র টান পড়ল সোহেলের ফাৎনায়। 'ওরেশ্ শা-লা!' বলে ছিপ ধরে হ্যাঁচকা টান লাগাল সোহেল। কিন্তু বাধল না মাছটা, ছুটে গেছে। ওদিকে টান খেয়ে পানি ছেড়ে উঠে পড়েছে বড়শি, ঘুরে এসে 'কুট' করে বিঁধে গেল ওটা রানার বাঁ কানের লতিতে।

'উফ্!' নড়ে উঠল মাসুদ রানা। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে সচকিত হলো। চোখ না মেলেই বুঝল বড়শি বেঁধার জন্যে নয়, আর কোন কারণে ব্যথা করছে কান। চট করে চোখ মেলল রানা।

'কি, চাঁদ?' কানটা ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল সোহেল, মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'খুব তো কাজের কথা বলে দিনের পর দিন বিদেশে পড়ে থাকা

হচ্ছে। টিএ ডিএর নাম করে রোজ শ'শ' ডলার ড্র করা হচ্ছে। এই নাকি সে কাজের নমুনা?'

'আরে! দোস্ত, তুই?' ঝট করে উঠে বসল মাসুদ রানা। ঘুমের রেশ মুহূর্তে কেটে গেছে। অনেক দিন পর প্রিয়তম বন্ধুর দেখা পেয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল রানা। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। নইলে কথা নেই বার্তা নেই লণ্ডনে কেন সোহেল? 'ব্যাপার কি, সোহেল? তুই হঠাৎ?'

'সে কি!' কৃত্রিম অবাক হলো সোহেল। বসে পড়ল বিছানায়। 'তুই জানিস্‌নে?'

'কিসের কথা?' চোখ কোঁচকাল রানা।

'তোকে ছাঁটাই করা হয়েছে! একেবারে যাকে বলে ডিসমিস।'

গম্ভীর হলো ও। 'আমার অপরাধ?'

যেন খুব দুঃখ পেয়েছে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সোহেল শব্দ করে। 'অযোগ্যতা, দোস্ত। অযোগ্যতা। আমি অনেকদিন ধরেই বুড়োকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, দোস্ত, যে তুই আর আগের সেই মাসুদ রানা নেই। ছাতা পড়েছে তোর রেপুটেশনে। তা কে শোনে কার কথা? তুই-ই বল, আমি তোর সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি তুই হচ্ছিস উলুবনের শেয়াল...' রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে শঙ্কিত হলো সোহেল, চট্‌ করে ছিপি আঁটল মুখে। ওর গতিবিধি লক্ষ করছে সতর্ক চোখে।

মুখ টিপে হাসল মাসুদ রানা। 'বোস্‌। হাত-মুখ ধুয়ে আসি,' অ্যাটাচড্‌ বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ও।

'ওই সঙ্গে শেষ গোসলটাও সেরে আসিস, দোস্ত,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল সোহেল। 'পাক সাফ হয়ে আসিস। পরে আর সুযোগ পাবি বলে মনে হয় না। বুড়ো আসছে,' তর্জনী দিয়ে জবাই করার ভঙ্গি করল

সে। 'আজই সেরে ফেলবে কাজটা।'

দরজা বন্ধ করতে গিয়েও থমকে গেল মাসুদ রানা। উবে গেছে হাসি। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে জিজ্ঞেস করল, 'বুড়ো আসছে মানে?'

সোহেলের হাসিখুশি চেহারা বিগড়ে গেল। 'অ্যাহ্! মহা যন্ত্রণায় পড়া গেল তো শালাকে নিয়ে, সোজা কথার মানে বোঝে না!'

খেপে গেল রানা। কিন্তু তলপেটের চাপ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অসহায় ও। 'রাখ, শালা! এসে দেখাচ্ছি মজা।' দড়াম করে দরজা লেগে গেল।

এরপর দুই বন্ধু মুখোমুখি হলে সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই হলো। মিনিট দুয়েক ঘরময় ছোটাছুটি, কিল, চড়, চিমটি, এ বলে 'তুই ছাড়!' ও বলে, 'আগে তুই ধরেছিস, তুই ছাড়!' চলল। তারপর জয়-পরাজয় অমীমাংসিত রেখেই মুখোমুখি বসে পড়ল দু'জন। আপাতত সন্ধি।

কফিতে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'তুই তাহলে ঢাকা থেকে নয়?'

'উঁহুঁ! বার্লিন থেকে।'

'বার্লিন! কেন?'

দাঁত খিঁচাল সোহেল। 'তোকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'ফের যদি কথা বাড়াস, এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে দেব তোর, শালা। যা জিজ্ঞেস করি, সরাসরি তার উত্তর দিবি।' ডান হাত মুঠো করে ওর নাকের সামনে ধরল রানা।

তৎক্ষণাৎ মাথা দোলাল সোহেল ভাল মানুষের মত। 'জ্বে, আজ্ঞে।' চোখ ট্যারা করে চেয়ে আছে হাতটার দিকে।

হেসে ফেলল রানা। 'ফাজলামো রাখ, দোস্ত। টেনশনে আমার অবস্থা টাইট। খুলে বল সব।'

কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল সোহেল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে

গিয়েও হাত টেনে নিল। ভেতর থেকে একটা বের করে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। 'আমি আসলে অন্য কাজে বার্লিনে গিয়েছিলাম। কাজ সেরে ঢাকায় রিপোর্ট করতে বুড়ো বলল এখানে চলে আসতে। বলল, আমি আসছি লণ্ডন। তুমি অপেক্ষা করো ওখানে, এক সঙ্গে ঢাকা ফিরব।'

'ব্যাস? কেন লণ্ডন আসছে, তা বলেনি?'

'না। তবে খানিকটা আভাস দিয়েছে। ওঁর আসার পিছনে কেজিবির হাত আছে।'

'কেজিবি?'

'আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেট প্রধান জেনারেল ভাদিম বরিসভ।'

'জেনারেল বরিসভ?' কপাল কুঁচকে উঠল রানার আপনাআপনি।

'হ্যাঁ। ওরা নাকি ঢাকায় তোর খোঁজ জানতে চেয়েছিল। ব্যাপার কি, রানা? ওদের লেজ মাড়িয়ে দিয়েছিস নাকি?'

মুহূর্তের জন্যে ডি অ্যাঙ্গাসের কথা ভাবল মাসুদ রানা। পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। না, ওটা হতে পারে না। নিশ্চয়ই আর কিছু আছে ভেতরে। কিন্তু এমন কি ব্যাপার থাকতে পারে যে কারণে জেনারেল বরিসভ ওকে খুঁজবেন, ভেবে পেল না।

'কিরে, কিছু বলছিস না যে?'

'কই, তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।'

'পড়বে পড়বে,' আপনমনে মাথা দোলাল সোহেল। 'ধোলাই খেলে সব মনে পড়ে যাবে।'

'চুপ থাক, শালা! কখন আসছে বুড়ো? ক'টায় ফ্লাইট?'

'সাতটায় হিথ্রোয় ল্যাণ্ডিঙ।'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'সোয়া পাঁচ। চল, ওঠ।'

'কোথায়!'

'এয়ারপোর্ট যেতে হবে না বস্‌কে রিসিভ করতে?'

'না। নিষেধ আছে।'

'কেন?'

'গোপনে আসছেন রাহাত খান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করা আছে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ডাউনিং স্ট্রীটে যাবেন তিনি। মীটিং সেরে নিজেই চলে আসবেন এখানে।'

'বলিস কি রে!' ভীষণ বিস্মিত হলো রানা। 'শুনে মনে হচ্ছে যেন...। এত কিছু ঘটছে লংফেলো জানেন না?'

'জানেন, তবে তোর চেয়ে কম।'

'মানে?'

'আমার আসার খবর জানা নেই তাঁর। জানেন কেবল রাহাত খানের খবর। তা-ও কেবল আসছেন, এটুকুই। কেন, জানেন না। তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বুড়োর মীটিঙের সময় সব জানতে পারবেন। তাঁকে ওখানে থাকতে বলা হয়েছে।'

'কিন্তু তুই এত খবর জানলি কি করে? তোকে নাকি কেবল আভাস দিয়েছে বুড়ো? এ যদি আভাস হয় তো ডিটেল বলে কাকে?'

মারফতি হাসি দিল সোহেল। 'এই কথা? তা আভাস থেকে যদি এসব সামান্য ব্যাপার বুঝে না-ই নিতে পারলাম, তাহলে কি আর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হওয়া চলে এত বড় এক ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্কের, তুই-ই বল?'

আচমকা গাঁট্টা চালাল রানা সোহেলের চাঁদি সই করে। ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল সোহেল গলা ফাটিয়ে। যন্ত্রণার চোটে লাফাচ্ছে তড়াক তড়াক। 'শালা, গণ্ডার! উহুরে, খুলি বোধহয় ফুটোই হয়ে গেছে রে!'

অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাসুদ রানার চেহারা। 'এই কথা? তা মেরে যদি এক আধটু ব্যথা না-ই দিতে পারলাম, তাহলে কি আর স্পাই হওয়া চলে, তুই-ই বল?'

ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। এক আধটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। এমন সময় ইয়র্কশায়ারের মেনউইথ লিস্নিঙ স্টেশনে ধরা পড়ল আরেকটা স্কোয়ার্ট ট্র্যান্সমিট করার ঘটনা। ওয়েলসের ব্রডি এবং চিকস্যাণ্ডস স্টেশনও ট্রেস করল ওটা। ট্র্যান্সমিশনের বিয়ারিঙ ও ক্রসবিয়ারিঙ গ্রহণ করল তারা একই সঙ্গে। শেফিল্ডের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে পাঠানো হয়েছে বার্তাটা।

দ্রুত জায়গামত পৌঁছে গেল শেফিল্ড পুলিস। বারনস্লি-পন্টিফ্র্যাক্ট সড়ক ওটা। কেউ নেই কোথাও। শূন্য সড়কটা যেন উপহাস করল দলটিকে।

'সেই একই ট্র্যান্সমিটার, স্যার,' গভীর রাতে রিপোর্ট করল চেনটেলহ্যামের হতাশ চীফ অ্যানালিস্ট। এবারও বার্তার মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে সে। 'আগের মতই তিন সেকেণ্ড স্থায়ী। কোন সন্দেহ নেই স্পাই বন্ধুটি কার-বোর্ন। ট্র্যান্সমিট সেরেই গাড়ি চালিয়ে সটকে পড়ে।'

'ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার,' বললেন কর্মকর্তা। 'লেগে থাকো। ভেবে পাই না ব্যাটা কাকে কি সংবাদ পাঠাচ্ছে!' শেষেরটুকু অন্যমনস্কের মত যেন নিজেকেই শোনালেন তিনি।

মস্কোয় ততক্ষণে বার্তাটা ডিকোড হয়ে পৌঁছে গেছে জেনারেল সেক্রেটারির সামনে। ওটা এরকম ঃ কুরিয়ার টু নেভার শোড। ইনফর্ম সূনেস্ট রি-অ্যারাইভেল সাবস্টিটিউট।

চার

টেবিলের ওপাশে বসেছেন বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। তাঁর ডানদিকে বিএসএস চীফ লংফেলো। এপাশে মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটা। মিনিট পাঁচেক হলো দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে ফিরেছেন দুই বৃদ্ধ।

লংফেলোর মুখে রক্ত নেই এক বিন্দু। চেহারা মরার মত ফ্যাকাসে। মাত্র গতকাল সকালেই ভদ্রলোকের সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ হয়েছে রানার। এই কয় ঘণ্টার ব্যবধানে কোন মানুষের চেহারা যে এমন অস্বাভাবিকভাবে বদলে যেতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। দু'গাল চুপসে ঢুকে গেছে ভেতরে। ত্বকের স্বাভাবিক লাবণ্য গায়েব হয়ে গেছে, খসখসে হয়ে উঠেছে চেহারা। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। অন্তঃসারশূন্য। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ফাঁসীর হুকুম হয়েছে বুঝি লংফেলোর। ধরেবেঁধে ঝোলাতে নিয়ে যাওয়া হবে এখনই।

রাহাত খানের অবস্থাও কম-বেশি একই রকম। কাঁচাপাকা ভুরুর নিচে চোখ দুটো লালচে। নিচে কালির প্রলেপ। কপালের দু'পাশের রগ ফুলে উঠেছে, লাফাচ্ছে তড়াক তড়াক। রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ। খেয়াল নেই কোনওদিকে, অন্যমনস্ক। গভীর দুশ্চিন্তার চিরাচরিত সেই লক্ষণটিও বিদ্যমান—হাতে লাইটার

থাকতেও আগুন না ধরিয়েই পাইপ টেনে চলেছেন।

মুখে তালা মেরে বসে আছেন দুই বৃদ্ধ। কথা নেই কারও মুখে। কি ঘটেছে, কেন আচমকা রাহাত খানের লণ্ডন ছুটে আসার প্রয়োজন হলো, কেন সোভিয়েত জেনারেল ঢাকায় খোঁজ করেছেন ওকে, এমনকি অনুমান করতেও ব্যর্থ হয়েছে মাসুদ রানা। সোহেলকে বার বার জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পায়নি। আসলে ঢাকার বাইরে ছিল বলে ও-ও রানার মতই অন্ধকারে আছে। জানে না ভেতরের খবর। নিশ্চয়ই অভাবনীয় একটা কিছু ঘটতে চলেছে, ভাবল রানা। নাকি ঘটেই গেছে?

'রানা, কেজিবির এফসিডি চীফ তোমার খোঁজ করেছিলেন ঢাকায়। শুনেছ নিশ্চই?' হঠাৎই মুখ খুললেন রাহাত খান।

'জ্বি, স্যার।' আনুষ্ঠানিক পরিচয় নেই রানার ভদ্রলোকের সঙ্গে, তবে দু'জন দু'জনের খুব ভালই চেনা। অতীতে বহুবার কর্মক্ষেত্রে তাঁর মুখোমুখি হতে হয়েছে মাসুদ রানাকে। ব্যক্তি বরিসভের নয়, তাঁর পরিকল্পিত কেজিবির কয়েকটি মিশনের। তিনি যেমন জানেন মাসুদ রানা কী চীজ, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্যে রানাও রীতিমত শ্রদ্ধা করে জেনারেলকে। 'কিন্তু কেন, স্যার? আমাকে তাঁর কি প্রয়োজন!'

'বলছি,' তর্জনী দিয়ে ডান চোখের পাতা চুলকালেন বৃদ্ধ। 'তবে তার আগে খানিকটা ভূমিকা প্রয়োজন। পুরোটা অল্প কথায় বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তবু, যতটা সংক্ষেপে পারা যায়, বলছি। '৬৮ সালের পয়লা জুলাই, তখনকার বিশ্বের প্রথম তিন পারমাণবিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফিকেশন ট্রিটি নামে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার, তার প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কিত ওটাই ছিল সর্বপ্রথম অফিশিয়াল চুক্তি। পৃথিবীর সবাই জানে এ চুক্তির কথা।

'পরে চার দফার আরও একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দেশ তিনটি, যার কথা ওরা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটি অত্যন্ত গোপনে করা হয়। ওরা বুঝতে পেরেছিল যে যে হারে এগোচ্ছে নিত্য নতুন নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাতে ভবিষ্যতে চরম অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে নিজেদেরই। নিজেরাই সৃষ্টি করে বসতে পারে হাজারো সমস্যা। যে কারণে বাধ্য হয়েই ওই চার দফা প্রটোকলে স্বাক্ষর করতে হয় ওদের। ওর প্রথম তিনটি প্রটোকল ছিল কে কি ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র বানাবে বা বানাতে পারবে এইসব সম্পর্কিত।

'কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, শেষ প্রটোকলটি বাদে অন্যগুলো মেনে চলার ব্যাপারে কোন পক্ষেরই বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। বরং প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল তারা কে কত বেশি বেশি ভাঙতে পারে ওগুলো। যে সব অস্ত্র ওই চুক্তিতে তৈরি নিষেধ ছিল, সেগুলো তো বটেই, তা ছাড়াও আরও মারাত্মক সব অস্ত্র বানিয়ে মজুদের পাহাড় গড়ে ফেলল দেশ তিনটি। তাতে লাভই বলি, আর লোকসানই বলি, কাজ হয়েছে এই, কেউ একটা ভয়ানক কিছু তৈরি করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'পক্ষ তার অ্যান্টিডোট আবিষ্কার করে তার হুমকি মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এতে শেষ পর্যন্ত কেউ কারও জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

'তবে সর্বশেষ, অর্থাৎ প্রটোকলটির ব্যাপারে সবাই খুব সচেতন ছিল। ওটা অমান্য করার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। ওটার আতঙ্ক তখনও যেমন ছিল, আজও তেমনি...কি বলব, একটা জান্তব দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করছে সবার ভেতর। কারণ কেউ যদি চতুর্থ প্রটোকল ভঙ্গ করে, তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যাবে পৃথিবী ধ্বংসের প্রক্রিয়া।' হঠাৎ করেই যেন পাইপের কথা মনে পড়ল বৃদ্ধের। চোখ কুঁচকে তাকালেন ওটার দিকে। তারপর তামাকে

আগুন ধরিয়ে টানতে লাগলেন আনমনে।

'ওই প্রটোকলের অঙ্গীকার কি ছিল, স্যার?' প্রশ্নটা করল সোহেল।

ঘুরে বিএসএস চীফের দিকে তাকালেন রাহাত খান। এর অর্থ বুঝতে দেরি হলো না স্যার লংফেলোর। 'আমি বলছি,' বললেন তিনি। 'পঁয়তাল্লিশ সালে হিরোশিমা-নাগাসাকির ওপর প্রথম আণবিক বোমা বর্ষণের পর থেকেই এই তিন দেশের নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টরা বোমাগুলোর আকার কত ছোট করা সম্ভব তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। সে সময় ওগুলোর আকার হত অনেক বড়, বিশাল। স্থানান্তর, পরিবহন ইত্যাদিতে সমস্যা হত খুব। সে গবেষণার ফল ফলেছে আশির দশকে। একটা আস্ত পারমাণবিক বোমা এখন ব্রিফকেসে ভরে অনায়াসে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শুধু তাই-ই নয়, নয়-দশটা প্রিফ্যাব্রিকেটেড অংশ যেখানে-সেখানে বসে বাচ্চাদের খেলনা কনস্ট্রাকশন কিটের মত জুড়ে বানানোও যাবে এ বোমা ইচ্ছে করলে। অদূর ভবিষ্যতে এমনটি যে ঘটবে, ষাটের দশকের শেষ দিকে বিজ্ঞানীরা তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। যে কারণে শেষ প্রটোকলের সৃষ্টি। এর মূল বক্তব্য ছিল এই তিন দেশের কেউ কোন অবস্থাতেই সহজে বহনযোগ্য খুদে পারমাণবিক বোমা বা তার বিযুক্তকৃত প্রিফ্যাব্রিকেটেড অংশসমূহ অপর দু'পক্ষের কারও ভৌগলিক সীমানার অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে পারবে না। বিজ্ঞানীদের অভিমত ছিল, এই চুক্তি কঠোরভাবে মেনে চলা না হলে পরস্পরের ভেতর স্যাবোটাজ আর কাউন্টার স্যাবোটাজে দেশ তিনটির ভবিষ্যৎ রকেট-মিজাইল মজুদ, ইলেক্ট্রোনিক কাউন্টারমেজারস্, আর্মস এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তার মানে...বলতে চাইছেন...।' থেমে গেল মাসুদ রানা। ঢোঁক গিলল। অজান্তেই পিঠের পেশী শক্ত হয়ে গেছে। সোহেলেরও একই

অবস্থা। দুই বন্ধুর হতভম্ব দৃষ্টি ঘন ঘন নেচে বেড়াচ্ছে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দুই বৃদ্ধের মুখের ওপর।

'ঠিকই ধরেছ তুমি, রানা,' বললেন রাহাত খান।

'রাশিয়া?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন তিনি। 'মাঠে নেমে পড়েছে ওরা এরই মধ্যে। টপ্ ক্লাস এক কেজিবি এজেন্ট ঢুকে পড়েছে ব্রিটেনে। কিন্তু জেনারেল বরিসভ ব্যাপারটা ঘটতে দিতে চান না; তিনি চান তাঁর এজেন্টটিকে বোমা অ্যাসেম্বলিঙের ব্যাপারে বাধা দেয়া হোক। তাই এ কাজে তোমার সাহায্য আশা করে ঢাকায় যোগাযোগ করেন জেনারেল। তোমার লণ্ডন অবস্থানের কথা জানেন তিনি। কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ করতে সাহস পাননি। প্রচুর ঝুঁকি ছিল ওতে।'

'কিন্তু, স্যার...'

'জানি কি বলতে চাইছ। উত্তরটা হলো: এর সঙ্গে কেজিবির অফিশিয়ালি কোন সংশ্রব নেই। সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অ্যাসাইনমেন্ট এটা। প্ল্যান অরোরা। অরোরার মূল পরিকল্পনা জিআরইউ চীফ মেজর জেনারেল সের্গেইভিচ মার্চেঙ্কোর। ব্রিটেনের আগামী সাধারণ নির্বাচনের ঠিক ছয় দিন আগে কোন এক ইঙ্গ-মার্কিন বিমানঘাঁটিতে দেড় কিলো টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাতে চলেছে রুশ এজেন্টটি। কিন্তু মুশকিল হলো লোকটি কে, কোথায় আছে, কোন্ বিমানঘাঁটিতে বোমা হামলা চালাতে যাচ্ছে, কিছুই জানা যায়নি। ইচ্ছে করেই জানাননি বরিসভ।'

'যাহ্!' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল সোহেলের।

চোখ মুদলেন রাহাত খান। মনে হলো উপায় নেই দেখে মনে মনে চূড়ান্ত হার স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ঝাড়া দু'মিনিট পর মুখ

খুললেন তিনি। 'রুশরা কেন এ পরিকল্পনা নিয়েছে, সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু এদিকে নির্বাচনের আর মাত্র একুশ দিন বাকি। যদি তার ছয়দিন আগে ফাটানো হয় বোমা, তাহলে হাতে থাকে মাত্র চোদ্দ দিন।'

'কিন্তু জানালেনই যখন, পুরোটা কেন জানালেন না ভদ্রলোক, স্যার?' ঝড়ের বেগে এলোমেলো সব ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে রানার মাথায়।

'কারণ আছে। এ কাজে যাকে ব্রিটেনে পাঠিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট, সে হাইলি ট্রেইনড্ এক কেজিবি স্পাই। ইললিগ্যালস্। লোকটি টপ ক্লাসদের মধ্যেও টপ ক্লাস। কেজিবির অমূল্য এক সম্পদ। তাই তাকে হারাবার ঝুঁকি নিতে চান না জেনারেল। সব জানিয়ে দিলে ধরা পড়ে যাবে লোকটা, সেই জন্যে। তাঁর সমস্যাটা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তুমি, রানা। জেনারেল চান না এমন দুনিয়া কাঁপানো কিছু ঘটুক, মৃত্যু হোক অসংখ্য নিরীহ নিরপরাধ বেসামরিক মানুষের। লক্ষ ওদের কোন বিমানঘাঁটি হলেও নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলও বিরান হয়ে যাবে বিস্ফোরণে। এর কোনটিই কাম্য নয় বরিসভের।'

মোনাজাত করার মত দু'হাতে অনবরত মুখ ডলছেন রিচার্ড লংফেলো। নিজের মাঝে ডুবে গেছেন বৃদ্ধ। কোন দিকে, কারও দিকে খেয়াল নেই। মানুষটির বুকের ভেতর কি তুফান চলছে, ভেবে খুব খারাপ লাগল রানার।

'এই বোমা হামলার পরিকল্পনা মস্কোর বাইরে উসভোয় করা হয়েছে। অত্যন্ত গোপনে। এতই গোপনে যে কেজিবিকেও জানানো হয়নি কিছু। জানেন কেবল এর মূল হোতা মার্চেঙ্কো, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আর তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত তিন বন্ধু। কোনও আভাস-ইঙ্গিত পেয়ে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ভেতরের খবর উদ্ধার করেছেন বরিসভ, পিছ পা হননি মারাত্মক ঝুঁকি আছে জেনেও। তিনি যেটুকু করেছেন, আমি মনে করি অনেক করেছেন।'

'ঠিক,' বলল মাসুদ রানা। 'স্বীকার করতেই হবে।' লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা আরও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল ওর। তাঁর এ তদন্তের খবর ফাঁস হয়ে গেলে পরিণতি কি হবে ভাবতেও শিউরে উঠল রানা। সব জেনে-বুঝেও এ পথে পা রেখেছেন জেনারেল, রীতিমত অবিশ্বাস্য। একইসঙ্গে নতুন এক শিক্ষাও হলো মাসুদ রানার। যে কেজিবিকে এতদিন পাষণ্ড, কসাই, হৃদয়হীন ভাবত ও, তার ভেতরে এমন এক-আধজন মানবদরদীও আছেন। কী আশ্চর্য!

'তবে লাঠির ক্ষতি না করে সাপ মারার পথটিও ভদ্রলোক দেখিয়ে দিয়েছেন। ঠিকমত এগোতে পারলে তাতে কাজ হবে।'

মেজর জেনারেলের মন্তব্যে নিকষ কালো আঁধারের মাঝে সামান্য এক চিলতে আলোর আভাস পেল রানা।

'প্রায় খালি হাতেই এদেশে ঢুকেছে স্পাইটি। সঙ্গে আছে কেবল একটা ওয়ান টাইম প্যাড।'

'আচ্ছা!'

'লংফেলোর ধারণা ওটার সাহায্যে এরইমধ্যে মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে অজ্ঞাত এক ফ্লীপার ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে।'

ঝট করে বিএসএস চীফের দিকে ফিরল রানা। 'তাই?'

করুণ হাসি ফুটল তাঁর মুখে। 'আমাদের চেলটেনহ্যাম জিসিএইচকিউর একটা রিপোর্ট পেয়েছি কাল দুপুরে। ওরা নাকি,' চট করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন বৃদ্ধ। 'এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি আগে একটা স্কোয়ার্ট মেসেজ ট্রেস করেছে।'

'কোথায়?' পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রানা।

'ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্টের একটা রাস্তা থেকে ট্র্যান্সমিট করা হয় ওটা। কাজ সেরে সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে সরে পড়েছে স্পাইটি। প্রথমে

খুব একটা গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু রাহাতের মুখে সব শুনে বুঝলাম এ সে না হয়েই যায় না।'

স্কোয়ার্টের বক্তব্য উদ্ধার অসম্ভব, জানে মাসুদ রানা। তাই ও নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। চিন্তিত মুখে ফিরল রাহাত খানের দিকে। 'যা বলছিলাম,' বললেন তিনি। 'বরিসভ জানিয়েছেন, বোমা তৈরির ছোট ছোট নয়টা উপাদান হাতে হাতে নয়দিক থেকে ঢুকবে ব্রিটেনে, এক এক করে পৌঁছবে তার হাতে। সবগুলো হাতে পেলে তবেই বোমা তৈরি সম্পূর্ণ করতে পারবে সে। নইলে নয়।'

'তার মানে যে কোন দিক থেকে, যে কোন পথে ঢুকতে পারে ওগুলো,' অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। 'সড়ক-আকাশ-সমুদ্র, নিশ্চই সব পথই ব্যবহার করবে ওরা?'

'নিশ্চয়ই!' জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে সায় জানালেন স্যার লংফেলো।

'এখন,' বললেন রাহাত খান, 'যদি এর দু'তিনটে চালান কোনমতে ঠেকিয়ে দেয়া যায়, তাহলেই ব্যর্থ হতে বাধ্য ওদের মিশন।'

'দু'তিনটে?' আবার চোখে আঁধার দেখতে আরম্ভ করল রানা।

'হ্যাঁ।' পাইপ ধরালেন বৃদ্ধ। ঘন ঘন টান দিয়ে পুরু ধোঁয়ার একটা পর্দা দিয়ে আড়াল করে ফেললেন নিজেকে। 'কারণ আমরা জানি না এক আধটা চালান খোয়া গেলে তার বিকল্প চালান পাঠাবার ব্যবস্থা ওরা রেখেছে কি না। আমার মনে হয় না রেখেছে। পুরো ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ, অথচ ওটারই বড় অভাব। এর মধ্যে নয়টা চালানই জায়গামত পৌঁছানো কঠিন। আর যদি রেখেও থাকে বিকল্প ব্যবস্থা, দু'তিনটের রিপ্লেসমেন্ট পাঠানোর সময় থাকবে না। সময়মত জিনিস না পৌঁছলে মস্কোকে জানাতে হবে, তারপর ওরা আবার তা পাঠাবে, সে তো আরও

লম্বা সময়ের ব্যাপার। তবু, পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে করেই হোক অন্তত দু'তিনটে চালান আটক করতেই হবে। তা যদি সম্ভব হয়, নির্ধারিত তারিখে যদি কাজটা করতে ব্যর্থ হয় ওরা। তাহলে বাধ্য হয়েই মস্কোকে মিশন পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এর পিছনে ওদের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, তা হাসিলের উপায় না থাকলে শুধু শুধু এত বড় একটা কাণ্ড ঘটাবার ঝুঁকি মস্কো নেবে না।

'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এর প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমাদের। তোমার ওপর ভদ্রমহিলার প্রচুর আস্থা।' কপাল চুলকালেন রাহাত খান। ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন পাইপে। 'ওদিকে জেনারেল বরিসভও তোমার ওপর নির্ভর করে আছেন। তুমি যদি... ।'

করণীয় ঠিক করে ফেলল মাসুদ রানা। 'দায়িত্বটা আমি নিচ্ছি স্যার।'

'ভাল করে ভেবে সিদ্ধান্ত নাও, রানা। সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকি আছে এ কাজে। তাছাড়া কাজটা তুমিই করে দেবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি আমি ওঁদের কাউকেই দেইনি। আমি এসেছি প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাটা বিস্তারিত জানাতে। কাজটা তুমি করবে কি না, তা সম্পূর্ণ তোমার নিজের ব্যাপার। ইচ্ছে হলে করতে পারো, ইচ্ছে না হলে ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগও রয়েছে।' কপাল চুলকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ।

'ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, স্যার,' দৃঢ় আস্থার সুর ফুটল রানার স্বরে। 'ঝুঁকির চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে চাই আমি।'

'বেশ।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাহাত খানের চেহারা, চেষ্টা করেও মনের ভাব চেপে রাখতে পারলেন না। স্যার মারভিন লংফেলোর মুখের মেঘও পলকে কেটে গেল। এমন ভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি, দেখে মনে হলো এতক্ষণ যেন দম বন্ধ ছিল বুকের ওপর মস্ত কোন চাপের কারণে। হঠাৎ করেই চাপমুক্ত হয়েছেন।

'তবে একটা কথা, স্যার।'

'জানি।' হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ওকে বৃদ্ধ। 'অপারেশন নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তোমার হাতেই থাকবে। ওসব আমি দেখব।'

মন দিয়ে সার্জেন্ট হিউই ও ব্রায়ানের মৌখিক স্টেটমেন্ট শুনলেন প্রবীণ চীফ সুপারিনটেণ্ডেন্ট অভ পুলিস। মাঝে মধ্যে একটা দুটো প্রশ্ন করলেন। সব শেষে নিশ্চিত হলেন যে এরা মিথ্যে বলেনি। সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু মুশকিল হলো, এ পেশায় দীর্ঘদিন জড়িত বলে সুপারের অভিজ্ঞতার ঝোলাটিও বেশ বড়। ভালই জানেন তিনি, সত্য বলেও কখনও কখনও এ ধরনের গেরো থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল হয়ে পড়ে।

এই ঘটনাটির কথাই ধরা যাক। রুশ নাবিকটি ছিল পুলিস কাস্টডিতে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সার্জেন্ট হিউইর বক্তব্য অনুযায়ী ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে লোকটি। এর কোন সাক্ষী নেই। ছাতে ছিল তখন একমাত্র হিউই। তাছাড়া এমন কোন কিছু ঘটেওনি যে নাবিকটির আত্মহত্যা করা জরুরি হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে কঠিন হবে প্রেসকে সামাল দেয়া। এমন একটা বাজার গরম করার সুযোগ ওরা ছাড়বে না কিছুতেই।

পুলিসি নৃশংসতা, ভাবলেন সুপার, এ ব্যাপারে স্থানীয় পত্রিকাগুলোর হেডিং নিশ্চয়ই এই হবে। কাজেই নিরীহ দুই সার্জেন্টকে রক্ষা করার জন্যে নাবিকটি টেম্পোরারি হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হয়ে এ কাজ করেছে বলে প্রমাণ করার ব্যবস্থা করতে হবে তাঁকে। এরপর সোভিয়েত কনসালের ধাক্কা তো রয়েইছে।

কোন জাহাজের নাবিক ছিল লোকটা, জানতে হবে, ভাবতে লাগলেন সুপার। তার ক্যাপ্টেনের জবানবন্দী নিতে হবে, তাকে দিয়ে দেহটা আইডেন্টিফাই করাতে হবে। আরও আছে, পুলিসে ফোন করেছিল কে, তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সের দুই স্টাফ,

ড্রাইভার আর মেল নার্স, ওদের জবানবন্দী নিতে হবে। ওয়ার্ড সিস্টার এবং পাকিস্তানি ডাক্তার ইকবালের জবানবন্দীও চাই। সব শেষে ফ্রন্ট-ডেস্ক পোর্টার।

ভোর চারটে থেকে টানা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শেষের পাঁচজনের বক্তব্য রেকর্ড করলেন পুলিস সুপার। চারজনের বক্তব্যে বোঝা গেল সত্যিই প্রচণ্ড মার খেয়ে জখম হয়েছে নাবিকটি, অমানুষের মত পিটিয়েছে ওকে নেড়রা। সবার শেষে, ফ্রন্ট-ডেস্ক পোর্টারের বক্তব্যে খানিকটা আশার আলো দেখা গেল। লোকটা জানাল, মৃত লোকটিকে দৌড়ে এসে লিফটে উঠতে দেখেছে সে। পরপরই সেখানে পৌছায় সার্জেন্ট হিউই। লিফটে উঠতে না পেরে সার্জেন্ট পিছনের স্টেয়ারওয়েলে গিয়ে ঢোকে। পরের ঘটনা তার জানা নেই।

আটটায় হাই তুলতে তুলতে অফিসে রওনা হলেন সুপার। রাতের ঘুম তো গেছেই, দিনেও হয়তো বিশ্রাম জুটবে না কপালে। অফিসে এসেই পোর্ট ট্রাফিক অফিসারকে ফোন করলেন তিনি। তার কাছে জানা গেল, আকাডেমিক কোমারভ নামে একটিই রুশ জাহাজ আছে জেটিতে। গতকালই এসেছে। ওটার ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি পাঠালেন সুপার। তারপর টেলিফোন করলেন গ্লাসগোর সোভিয়েত কনসালকে।

টেলিফোনের আওয়াজে গাল ভর্তি একরাশ শেভিং ফোম নিয়ে বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল বিএসএসের গ্লাসগো স্টেশন চীফ, হ্যারি ফরবস। এক হাতে রেজর। অন্য হাতে রিসিভার তুলল সে। 'হ্যালো!'

'মিস্টার ফরবস? আমি ক্রেইগ।'

কপাল কুঁচকে উঠল স্টেশন চীফের। ক্রেইগ প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনের একজন প্লেন ক্লথ ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর।

'ইয়েস, ক্রেইগ। হোয়াট ইজ ইট?' চুপ করে দু'মিনিট লোকটির কথা

শুনল স্টেশন চীফ। তারপর যেন নিজেকে শোনাচ্ছে এমন ভাবে বলল, 'রিয়েলি?'

'হ্যাঁ। এর মধ্যে আরও গভীর কিছু আছে।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

লাইন কেটে দিয়ে খানিক চিন্তা করল হ্যারি ফরবস। তারপর জোর পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। সাড়ে আটটা বাজে। তাড়াহুড়ো করে শেভ সেরে পোশাক পরল সে। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে। ছুটল সোজা পুলিস সুপারের অফিস। একই সময় সিটি মর্গে পৌঁছল আকাডেমিক কোমারভের ক্যাপ্টেন আর পলিটিক্যাল অফিসার। এক পলক আঁদ্রেই পাভলভের দেহের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল দু'জনেই।

'ঠিকই আছে,' বলল দ্বিতীয়জন। 'এ আমার শিপের ডেকহ্যাণ্ড। আমরা আমাদের কনসালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দুজনকেই বেশ বিচলিত দেখে মর্গের ডিউটি সার্জেন্ট ভাবল, একজন শিপমেট হারিয়ে বড্ড দুঃখ পেয়েছে নিশ্চয়ই। 'চলুন,' ওদের পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এল সে। 'আমাদের সুপারিনটেণ্ডেন্টের অফিসে যাওয়া যাক। ন'টায় ওখানে আসবেন আপনাদের কনসাল।'

ওরা পৌঁছার আগেই এসে পড়েছেন সোভিয়েত কনসাল। পুলিস সুপারের মুখোমুখি বসে আছেন তিনি। পাশেই আরেকজন বসা, বিএসএস স্টেশন চীফ।

'এ আমি বিশ্বাস করি না যে লোকটা আত্মহত্যা করেছে,' ক্যাপ্টেন আর পলিটিক্যাল অফিসার ভেতরে পা রাখতেই ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন কনসাল। 'অনতিবিলম্বে আমার এমব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই...'

বাহু ধরে কনসালকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল পলিটিক্যাল অফিসার। রুমের এক কোণে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কী সব যেন

বোঝাল তাঁকে। পলকে চেহারা বদলে গেল ক্রুদ্ধ কনসালের। তিন মিনিট পর সুপারের টেবিলে ফিরে এলেন তিনি।

একেবারে শান্ত হয়ে গেছেন। জানালেন, এমব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ তিনি অবশ্যই করবেন। তবে পরে হলেও চলবে, তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।

কনসাল আশা করেন, আঁদ্রেইকে যারা মারধর করেছে, পুলিস সেই নেডদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। মাননীয় সুপারের পক্ষে কি সম্ভব হবে, আঁদ্রেই পাভলভের মৃতদেহ এবং তার সঙ্গে যা যা ছিল সে সব আকাডেমিক কোমারভে তুলে দেয়া? জাহাজটি আগামীকালই লেনিনগ্রাদ রওনা হবে।

অত্যন্ত প্রশান্ত মেজাজে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে অনুরোধটা প্রত্যাখ্যান করলেন সুপার। যতক্ষণ না বখাটেগুলোকে পাকড়াও করা যায়, দেহটা সিটি মর্গেই থাকবে। আর তার জিনিসপত্র যত্ন করে রেখে দেয়া হবে প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনে। মৃদু হাসির ভঙ্গি করে সিদ্ধান্তটা মেনে নিলেন সোভিয়েত কনসাল। নিয়ম কানুন ভালই জানেন তিনি। এরপর বিদেয় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বেরিয়ে পড়লেন তিনি কনসুলেটের উদ্দেশে।

পিছন পিছন বেরিয়ে এল হ্যারি ফরবসও। মর্গের দিকে গাড়ি ছোটাল সে। পোস্টমর্টেম রুমের এক কোণে ড্রেনের ওপর বসানো বড় একটা স্ল্যাবে শোয়ানো আছে পাভলভের দেহটা। ব্যবচ্ছেদ শুরু করার জন্যে পুলিস প্যাথলজিস্ট প্রস্তুত।

'দেহটা আমি একটু দেখতে পারি?' লোকটিকে জিজ্ঞেস করল ফরবস।

তার আইডি কার্ডে চোখ বুলিয়ে মাথা দোলাল সে। 'শিওর।'

খুব কাছ থেকে দশ মিনিট ধরে দেহটা পর্যবেক্ষণ করল ফরবস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর বেরিয়ে এসে নিজের অফিসে রওনা হলো।

পাঁচ

জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে এসে বসল টেবিলে। ওর সামনেই চেলটেনহ্যাম জিসিএইচকিউর পাঠানো রিপোর্টের একটা কপি রয়েছে। অসংখ্যবার পড়েছে ওটা রানা, প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। আরও একবার পড়ল। তারপর বিরক্ত হয়ে ঝপ করে বন্ধ করল ফাইল কভারটা।

ওটা সরিয়ে আরেকটা পেটমোটা ফাইল টেনে আনল মাসুদ রানা। গত এক সপ্তাহে আকাশ-সড়ক-সমুদ্রপথে যত বহিরাগত ঢুকেছে এ দেশে, তাদের নাম এবং পাসপোর্ট নাম্বারের পূর্ণ তালিকা আছে এতে। মাত্র ছয় ঘণ্টায় দেশের প্রত্যেকটি এনট্রি পয়েন্ট থেকে কম্পিউটরের মাধ্যমে এগুলো পৌঁছেছে রানার টেবিলে। ওর মধ্যে রুশ ব্লকভুক্ত দেশগুলো থেকে যারা এসেছে, তাদের তালিকা আলাদা।

এরকম জটিল, সময়সাপেক্ষ একটা কাজ এত দ্রুত সম্পন্ন হওয়া এক কথায় অসম্ভব। কিন্তু রানা এজেন্সির বিশেষ নির্দেশে সেটাই সম্ভব করে তুলেছে এদের নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ প্রশাসনযন্ত্রের একটি অংশ। যদিও এর ভেতর থেকে অলৌকিক কোন ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করে না মাসুদ রানা। সব জটিলতারই সীমা আছে। কিন্তু এটা এমনই জটিল, যার কোন সীমা নেই।

তবুও ভরসা করে আছে মাসুদ রানা। ওর বিশ্বাস, সমস্যা যত জটিল আর কুটিলই হোক, ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে পারলে সমাধানের একটা না একটা পথ পাওয়া যাবেই। তাছাড়া সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন ওকে সহায়তা করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেছে পিছনে। ভরসা করার ওটাও একটা বড় কারণ। এই ব্যাপক অভিযানের নাম রাখা হয়েছে 'অপারেশন ব্লাইণ্ড হান্ট'। এর সর্বময় ক্ষমতা মাসুদ রানার হাতে। ওর মুখের নির্দেশই এখন আইন।

এরই মধ্যে কাজে নেমে পড়েছে কয়েক হাজার অপারেটর-ওয়াচার। রানা এজেন্সির প্রায় সবাই তো রয়েইছে, সঙ্গে বিএসএস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, এমআইফাইভ, এমআই সিক্স, আর্মড ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স এবং পুলিস সবাই রয়েছে এর মধ্যে। ব্রিটেনের প্রত্যেকটি বিমান বন্দর, নৌ-বন্দর, ফেরিঘাট এবং বর্ডার পোস্ট, মোট কথা প্রতিটি এনট্রি পয়েন্টে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে তারা।

ব্রিটেনে যারা ঢুকতে চাইবে, বিশেষ করে রুশ ব্লকের বা খোদ রুশ নাগরিক, ঢুকতে পারে স্বচ্ছন্দে। বাধা দেয়া হবে না। তবে তাদের পাসপোর্ট, ব্যাগেজ, গাড়ি ইত্যাদি চেক করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। কারও ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয়, সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে আশেপাশে উপস্থিত'মেট'-কে, বা রানা এজেন্সি নয়ত বিএসএস স্টেশন চীফকে। তবে সন্দেহ হলেই গ্রেফতার করা যাবে না কাউকেই। আড়াল থেকে ছবি তুলতে হবে তার এবং মাসুদ রানার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বা তাদেরকে অনুসরণ করে যেতে হবে।

বিএসএস চীফের পাশের রূমটিকে করা হয়েছে 'অপারেশন ব্লাইণ্ড হান্টের' কন্ট্রোল রূম। তার পাশেরটা কমিউনিকেশনস রূম। ডজনখানেক লাল টেলিফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটর সব মিলিয়ে এলাহি কারবার। কিন্তু এত আয়োজন, এত কিছু তবু কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে মন। পারবে তো

ও? দুপুরে সোহেল ও মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান লণ্ডন ত্যাগ করেছেন। তখন থেকেই বিষণ্নতা পেয়ে বসেছে রানাকে। দুনিয়াতে নিজেকে একদম একা, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে ওর।

জোর করে কাজে মন দিল মাসুদ রানা। সভ্লকের ইমিগ্রান্টদের ফাইল খুলে নজর বোলাতে লাগল। কিন্তু মিছেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল খানিকক্ষণ, দাঁত ফোটাতে পারল না। কোন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ কাজ করতে যাচ্ছে, পরে শুনেছে ও রাহাত খানের মুখে। বুঝতে দেরি হয়নি লেবার পার্টির ভেতরের কারা এ কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে মস্কোকে। ওদের সঙ্গে এদের গোপন আঁতাতের কথা আরও আগে থেকেই জানে রানা। কিছু কিছু ঝামেলার জন্যে দেরি হয়ে গিয়েছিল, নইলে এই আঁতাতে লেবার পার্টির কে কে জড়িত, তাদের নাম এবং অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ আরও আগেই বিএসএসের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল রানা। কিন্তু হলো না।

সময়ের সামান্য হেরফেরের কারণে রানাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ওরা এবার। যত তথ্য-প্রমাণই থাকুক, কিছু যায় আসে না এখন। ওদের বিরুদ্ধে এ মুহূর্তে কিছু করতে গেলে বিপদে পড়ে যাবে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভরা। দ্রুত জনসমর্থন হারাবে। যার প্রভাব পড়বে নির্বাচনে। কাজেই ওই পর্যন্ত আঙুল কামড়ানো ছাড়া উপায় নেই। এমনিতে ক্ষমতাসীনদের হেরে যাওয়ার কোন কারণ নেই। সর্বশেষ বিবিসি জনমত জরিপের ফলাফলে লেবারদের চাইতে প্রায় পনেরো শতাংশ এগিয়ে আছে ওরা।

মস্কোপন্থীদের জুজুর ভয়ে যদি ব্যবধান আরও খানিকটা কমেও যায়, খুব বেশি হলে পাঁচ ভাগ কমবে। অতএব দুশ্চিন্তার কিছু নেই, নিজেকে প্রবোধ দিল মাসুদ রানা। ভালয় ভালয় শেষ হোক নির্বাচন, তারপর দেখা

যাবে।

রাত ন'টায় উঠল ও। কমিউনিকেশনস্-এর সহকারীদের নির্দেশ দিল জরুরি কোন খবর এলে যেন সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয় ওকে। বেরিয়ে এসে গাড়ি ছোটাল রানা। মাথাটা পরিষ্কার রাখা চাই। তাই আজ আর কাজ নয়। লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে সকালে শুরু করা যাবে নতুন উদ্যমে।

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙানো হলো মাসুদ রানার। জানানো হলো চেলটেনহ্যাম জিসিএইচকিউ আরও একটি স্কোয়ার্ট মেসেজ ট্রেস করেছে খানিক আগে। তড়াক করে বিছানা ছাড়ল ও। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল কন্ট্রোল রুমের উদ্দেশে। সংস্থা প্রধানের ফ্যাক্স করে পাঠানো সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের ওপর কয়েকবার চোখ বোলাল ও। সেই একই ব্যাপার। তিন সেকেণ্ড স্থায়ী ক্ল্যানডেস্টাইন মেসেজ। ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে শেফিল্ডের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে।

প্রথমবার ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্ট, ভাবছে রানা, তারপর শেফিল্ডের উত্তরে...রুশ স্পাইটি কি নর্থ মিডল্যাণ্ডের কোথাও আস্তানা গেড়েছে? নাকি প্রমাণ করতে চাইছে সে ওখানেই আছে? আসলে ওর ধারেকাছেও নেই, আছে দূরে কোথাও? তাই হবে হয়তো। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে লোকটা কার বোর্ন। ভাবছে মাসুদ রানা। পাশের রুম থেকে একটু পর পরই টেলেক্স-ফ্যাক্স মেশিনের-মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। নতুন নতুন নামের তালিকা আসছে তো আসছেই।

পুব ইউরোপীয় দেশগুলোর ইমিগ্রান্টদের নামের পাশে স্টার মার্ক করা আছে। সহকারীরা ওগুলোর আলাদা তালিকা তৈরি করে ফাইলবন্দী করছে। বাঁধা নিয়মে এগোচ্ছে সব কাজ। শুধু একটা ফাঁক চাই, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। কেবল একটা সুযোগ। টেলিফোনের আওয়াজে চমকে উঠল অন্যমনস্ক রানা। দ্রুত রিসিভার তুলল। 'ইয়েস!'

'আপনার কল, স্যার। গ্লাসগো বিএসএস স্টেশন চীফ।'

'পুট মি থ্রু, প্লীজ। থ্যাঙ্ক ইউ। ...মাসুদ রানা। ইয়েস, গুড মর্নিং।' ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল ও দীর্ঘ সময় ধরে। টের পেল গরম রক্তের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে শিরায় উপ-শিরায়। বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার ফরবস,' বলল রানা। 'নেক্সট অ্যাভেইলেবল্ শাটলে গ্লাসগো আসছি আমি। নিজে চেক করতে চাই।'

'আমি থাকব এয়ারপোর্টে,' বলল ফরবস।

'দ্যাট'স ভেরি কাইণ্ড অভ ইউ।'

গ্লাসগো বিমানবন্দর শহর থেকে আট মাইল দূরে। আকাশ পথে লণ্ডনের সঙ্গে দেড় ঘণ্টার দূরত্ব। বিকেল সাড়ে তিনটেয় অবতরণ করল মাসুদ রানার বিমান। হ্যারি ফরবস রানার প্রায় সমবয়সী। সামান্য খাটো। থ্যাবড়া নাক। পরিচয় পর্ব সেরে এয়ারপোর্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। ফরবসের অপেক্ষমাণ গাড়ি নিয়ে রওনা হলো শহরের দিকে।

পাঁচ মিনিটেই ঘটনা বিস্তারিত শোনা হয়ে গেল মাসুদ রানার। 'আমার ধারণা সঠিক, এমন দাবি করছি না,' সবশেষে যোগ করল স্টেশন চীফ। 'তবে লাশটা দেখে মনে হয়েছে কস্মিনকালেও পাভলভ মার্চেন্ট নেভি ছিল না।'

'আপনি খবর পান কি ভাবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'পুলিস সুপারের নির্দেশে এক ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ফোন করে জানায় আমাকে।' লাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে গাড়ি দাঁড় করাল ফরবস। 'যে দুই পুলিস সার্জেন্ট উদ্ধার করেছিল পাভলভকে, তাদের রিপোর্টে লেখা দেখলাম লোকটা উপুড় অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল পথে। যেটা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। এ ধরনের গণপিটুনির শিকার

উপুড় হয়ে থাকতে পারে না, মারের চোটে দেহ তার আপনাআপনিই কুণ্ডলি পাকিয়ে যাবে। এবং জ্ঞান হারালে ওই অবস্থায়ই হারাবে।'

সবুজ আলো জ্বলে উঠল। গীয়ার দিল হ্যারি ফরবস। 'আরও আছে। কাঁধের গানি স্যাকটা দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে দেখেছে তাকে দুই সার্জেন্ট। এ-ও নিঃসন্দেহে আরেক অসম্ভব। আঘাত থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা না করে কেউ অমন কাজ করে?'

প্রশ্নটা মনে ধরল মাসুদ রানার। ক্রমাগত বুটের লাথির হাত থেকে মাথা না রক্ষা করে সামান্য...। 'তারপর ধরুন,' আবার শুরু করল ফরবস। 'ঘটনার সময় আর স্থানের বিষয়টাও ভেবে দেখেছি আমি। রাতে কোন সীম্যান ঘাটে বাঁধা জাহাজ ত্যাগ করে বারে যাওয়ার জন্যে। অথবা ব্রোথেলে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু এই লোক? রাত দুটোয় পোর্টের চার মাইল দূরের এক ডুয়াল ক্যারিজওয়েতে শিকার হলো নেডদের। কিন্তু কেন গেল সে ওখানে? বার নেই, রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় বার। ব্রোথেলও ওদিকে নয়। তাহলে কোথায় যাচ্ছিল পাভলভ?'

'ভাল একটা পয়েন্ট।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। স্টেশন চীফকেও অফার করল। 'কিন্তু লোকটা যে মার্চেন্ট নেভি ছিল না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কি করে?'

'লাশ দেখতে মর্গে গিয়েছিলাম আমি। পতনের ফলে হাড়গোড় চুরমার হয়ে দেহটা দেখার যোগ্য না থাকলেও ব্যাটার মুখ সামান্য দু'চারটে কাটাকুটির চিহ্ন ছাড়া প্রায় অক্ষতই ছিল। আমি এ শহরেই মানুষ, জীবনে কম ডেকহ্যাণ্ড দেখিনি। ওদের চেহারা হয় রোদে পোড়া, তামাটে। কিন্তু এ ছিল ধপধপে ফর্সা। এছাড়া হাতের উল্টোপিঠও তামাটে হয়। তালু হয় কর্কশ। কিন্তু এর হাতে তেমন কোন আলামত ছিল না। মনে হয়েছে আকাডেমিক কোমারভে পা রাখার আগ পর্যন্ত ফাইল ওঅর্ক করেই

কাটিয়েছে পাভলভ।

'আরও একটা সন্দেহের কারণ লোকটার সোনা বাঁধানো দুটো দাঁত। রুশ ফোরডেক ক্রুদের দাঁত সব সময় দেখে এসেছি স্টীল বাঁধানো হয়ে থাকে, রাশান স্টাইলে। ওদেশে সোনা দিয়ে···ব্যাপারটা নিশ্চয়ই প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। অন্তত একজন ডেকহ্যাণ্ডের পক্ষে।'

আনমনে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। মনে মনে লোকটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না। কিছুই দৃষ্টি এড়ায়নি। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল হ্যারি ফরবস। 'আর একটা পয়েন্ট।' সুপারের সামনে সোভিয়েত কনসালের আকস্মিক রেগে ওঠা, পরমুহূর্তে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও পলিটিক্যাল অফিসারের আগমন, অতঃপর কানে কানে আলোচনা এবং সবশেষে কনসালের সুমতির উদয় ইত্যাদি খুলে জানাল সে। 'আমার ধারণা বিষয়টি যাতে বেশি গড়াতে না পারে, সে জন্যে পলিটিক্যাল অফিসারের পরামর্শেই ভিজে বেড়াল বনে গিয়েছিল কনসাল। নইলে লোকটা যে ভাবে খেপে উঠেছিল, অত সহজে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা নয় ব্যাপারটা।'

সোজা প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনে এল ওরা। অপারেশন ব্লাইণ্ড হান্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার মাসুদ রানার আসার খবর স্টেশন চীফকে আগেই দিয়ে রেখেছিল হ্যারি ফরবস। স্টেশন চীফ নিজে স্বাগত জানাল ওদের কারপার্কে। সময় নষ্ট না করে পথ দেখিয়ে ভবনের পিছনদিকের ফাইলিং কেবিনেটে ঠাসা খুদে একটা রূমে নিয়ে এল সে ওদের দুজনকে।

'সার্জেন্ট হিউই আর ব্রায়ানের রিপোর্ট পাবেন টেবিলের ড্রয়ারে,' ঘরের একমাত্র টেবিলটি দেখিয়ে বলল চীফ। 'পাভলভের জিনিসপত্রও ওখানেই আছে। আমি আমার অফিসে আছি। কোন প্রয়োজন হলে খবর দিতে দ্বিধা করবেন না, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ।'

একজন সার্জেন্টকে রানার প্রয়োজনের ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে বিদেয় নিল লোকটি। প্রথমেই হিউই ও ব্রায়ানের বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ায় মন দিল মাসুদ রানা। ওর জানা হলো না যে ছুটে পালাবার আগে ডেকহ্যাণ্ড পাভলভ হিউইর সামনে থেকে তার টোব্যাকো টিনটা তুলে নিয়েছিল, পালাতে চেয়েছিল ওটা নিয়েই। জানা হয়নি কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেছে সে। কয়েকবার করে পড়ল রানা রিপোর্ট দুটো।

তারপর ভাবতে বসল। ধরা যাক, পাভলভ এদেশে বেআইনীভাবে প্রবেশ করেছে। করে থাকতে পারে। অসম্ভব নয়। তবে ফরবসের কাছে শুনেছে রানা, জাহাজের ক্রু লিস্টে তার নাম ছিল। এর একটাই অর্থ হতে পারে, এ লোক নকল পাভলভ। আসল ডেকহ্যাণ্ড পাভলভের পরিবর্তে নকল পে-বুক তৈরি করে পাঠানো হয়েছে একে লেনিনগ্রাদ থেকে।

ঠিক আছে, না হয় তাই। কিন্তু কেন এসেছিল সে? অত রাতে জাহাজ ত্যাগ করার কি কারণ তার? গ্রেট ওয়েস্টার্ন রোডে কেন গিয়েছিল? কারও হাতে গোপন কিছু তুলে দেয়ার জন্যে? কাজটা কি সম্পন্ন করতে পেরেছে পাভলভ? যদি পেরে থাকে, তাহলে গানি স্যাকটা রক্ষার জন্যে পড়ে পড়ে মার খেল কেন সে?

রিপোর্ট দুটোর সঙ্গে পিন আপ করা পাভলভের সঙ্গে প্রাপ্ত আলামতের তালিকাটার ওপর চোখ বোলাল রানা আবার। ওটা লেখা এভাবেঃ হাতঘড়ি ১টি, অ্যানোরাক ১টি, রোলনেক পুলওভার ১টি, ক্যানভাস গানি স্যাক ১টি, পুরু নিট জার্সি ১টি, টোব্যাকো টিন ১টি, ট্রাউজার ১টি, অন্তর্বাস ১টি, পুরু উলের মোজা একজোড়া এবং চামড়ার জুতো একজোড়া।

নিচের ড্রয়ার খুলল ও। বড় একটা পলিথিন ব্যাগে রাখা আছে

আলামতগুলো। জুতোজোড়া দিয়ে শুরু করল রানা। হিলের ভেতর কোন গোপন কুঠুরি আছে কি না, সোল বিযুক্ত করে ভেতরে কিছু রাখার ব্যবস্থা আছে কি না বা ভেতরে, একদম মাথার দিকে কোন গহ্বর আছে কি না আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখল রানা। কিন্তু না, নেই তেমন কিছু। ও দুটো ছেড়ে হাতঘড়ি নিয়ে পড়ল ও।

কাঁচের কোন খবর নেই। সেকেণ্ডের কাঁটাটিও উধাও। ভালমত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো রানা হাতঘড়িটা স্রেফ হাতঘড়িই। অন্য কিছু নয়। এরপর ট্রাউজার। কোমর বা ফ্লাইয়ের কোথাও কোন নতুন সেলাই পড়েছে কি না, চাপ দিলে শক্ত কিছু বাধে কি না ওসব জায়গায়, কোথাও কোন পট্টি আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। নেই।

এরপর অ্যানোরাক, রোলনেক পুলওভার, নিট জার্সি এবং মোজা। কোনটির সঙ্গেই সন্দেহজনক কিছু নেই। এবার গানি স্যাক। ওটা স্পর্শ করামাত্রই কেন যেন মনে হলো মাসুদ রানার যে রহস্যময় নাবিকটি যদি সঙ্গে করে সত্যিই কিছু এনে থাকে, তা এর মধ্যেই রয়েছে। টোব্যাকো টিন রেখে ব্যাগটাই ধরল ও প্রথম। অনেকক্ষণ পর নিশ্চিত হলো ও যে আসলেই ওটা একটা ব্যাগ। তলাটা দুই পাল্লা ক্যানভাসের, বাকি চারদিক এক পাল্লার। এবং ওর আইলেট দুটো মিনিয়েচার কোন ট্র্যান্সমিটার নয় বা ড্রস্ট্রিং কোন গুপ্ত অ্যারিয়েলও নয়।

সবশেষে টোব্যাকো টিন। রাশিয়ায় তৈরি সাধারণ স্ক্রু-টপ টিন। মুখ খুলতে ভেতরে তামাকের মৃদু গন্ধও পাওয়া গেল। টিন উপুড় করে ভেতরের জিনিসগুলো টেবিলের ওপর ঢালল মাসুদ রানা। আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে এল হ্যারি ফরবস। 'কি ওগুলো?'

চোখ কুঁচকে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল রানা। শুনতে পায়নি প্রশ্নটা। তিনটে ধাতব চাকতি। দুটো অ্যালুমিনিয়ামের মত চকচকে, হালকা।

অন্যটার রঙ সীসার মত, ওজনেও বেশ ভারি। চাকতি তিনটে পাশাপাশি সাজিয়ে চেয়ে থাকল রানা। ফরবস এবং সার্জেন্টও চেয়ে আছে। হালকা চাকতি দুটোর ব্যাস তিন ইঞ্চি, অন্যটির দুই ইঞ্চি। কেমন শির শির করে উঠল রানার গায়ের ভেতর। কি ওগুলো!

রাত ন'টায় লণ্ডন ফিরে এল মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টের শর্ট-টার্ম পার্ক থেকে নিজের গাড়িটা সংগ্রহ করে এম-ফোর মোটরওয়ের দিকে চলল। মোটরওয়েতে উঠে গতি বাড়াল ও, দ্রুতবেগে ছুটল দক্ষিণে। দশ মিনিট চলার পর এক তেমাথায় পৌঁছল। বাঁ দিকেরটা গেছে লণ্ডন, ডানদিকেরটা বার্কশায়ার।

ডানে বাঁক নিল মাসুদ রানা। টানা আধঘণ্টা ছোটার পর পৌঁছল গন্তব্যে। আলডারমাস্টন জায়গাটার নাম। ব্রিটেনের ইনস্টিটিউট অভ অ্যাটমিক ওয়েপনস্ রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট-এর বিশাল কমপ্লেক্স রয়েছে এখানেই। নাম শুনে বোঝা না গেলেও এটি আসলে মাল্টি ডিসিপ্লিন ইউনিট। নিউক্লিয়ার ডিভাইস ডিজাইন এবং তৈরি করা ছাড়াও কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, এঞ্জিনীয়ারিং, অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিকস্, রেডিও বায়োলজি, ইলেক্ট্রোনিকস্ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের ওপরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় এখানে। একই সঙ্গে মেটালারজি ডিপার্টমেন্টও রয়েছে এর।

শেষের এই ডিপার্টমেন্টের এক বিজ্ঞানীকে চেনে মাসুদ রানা। অনেক দিন আগে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা বোমা তৈরির কাজে কোন কোন ধাতব বেশি ব্যবহার করে, লণ্ডনে একদল ইন্টেলিজেন্স অফিসারের উদ্দেশে তা নিয়ে বিশেষ এক কোর্সে ভাষণ দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। রানাও ছিল ওই অফিসারদের মধ্যে।

'ওয়েল ওয়েল,' রানার পরিচয় এবং তাঁর সঙ্গে ওর পরিচয়ের সূত্র শুনে মৃদু হাসলেন বিজ্ঞানী, প্রফেসর ডেভিড ওয়েন। ওয়েলশ অ্যাকসেন্টে

বললেন, 'দারুণ স্মরণশক্তি আপনার। নাম-ধাম সব মনে রেখেছেন আমার! অল রাইট, মিস্টার মাসুদ রানা। বলুন কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে।'

পকেট থেকে ধাতব চাকতি তিনটে বের করল মাসুদ রানা। টিনটা আনেনি ও, রুমালে মুড়ে নিয়ে এসেছে এগুলো। 'এই জিনিসগুলো ঠিক চিনতে পারছিনে, প্রফেসর। এগুলো কি, কি কাজে লাগে যদি দয়া করে জানান, খুব উপকৃত হব।'

চাকতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন প্রফেসর ওয়েন। 'কি এগুলো!' আপনমনে বললেন। 'কোন দুরভিসন্ধিমূলক কাজে ব্যবহার হতে পারে বলে ভাবছেন?' মুখ তুললেন তিনি।

'হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, পারে। পরীক্ষা না করে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।'

'কত সময় লাগতে পারে, প্রফেসর?'

'ঘণ্টাখানেক লাগবে। সকালে ল্যাব টেস্ট সেরে আপনাকে জানাতে পারব। যদি এগুলো রেখে যেতে আপত্তি না থাকে আপনার।'

পকেট থেকে কার্ড বের করে প্রফেসরের দিকে বাড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা। 'কোন আপত্তি নেই। তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রফেসর। আমার সন্দেহ এর সঙ্গে ব্রিটেনের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। টেস্ট সেরে এর যে কোন একটি নাম্বারে ফোন করলেই পাবেন আমাকে। এবং দয়া করে গোপন রাখবেন বিষয়টা।'

কার্ডে চোখ বুলিয়ে মাথা দোলালেন ধাতু বিশারদ। 'অফকোর্স।'

পরদিন সকাল দশটায় ফোন করলেন প্রফেসর ডেভিড ওয়েন। 'মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ইয়েস, প্রফেসর।'

'আপনার জিনিসগুলো পরীক্ষার কাজ শেষ করলাম এইমাত্র।'

'কি বুঝলেন?'

'খুবই ইন্টারেস্টিঙ। সম্ভব হলে এখনই চলে আসুন। ফোনে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়তো ঠিক হবে না।'

'মনে করুন রওনা হয়ে গিয়েছি আমি, প্রফেসর।'

'গুড।'

আলডারমাস্টন কমপ্লেক্সের ভিজিটর'স কার পার্কে একটাই মাত্র স্লট খালি। সাঁ করে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল রানা ওর মধ্যে। পঁচিশ-ত্রিশ পা হেঁটে মেইন কমপ্লেক্স বিল্ডিঙের রিসেপশন ডেস্কে পৌঁছে নিজের নাম জানাল অ্যাটেনডেন্টকে। বাঁ দিকে রাখা একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ির ভেতর থেকে কয়েকটা পাস তুলে নিয়ে চোখ বোলাল লোকটা। ওর থেকে একটা আলাদা করে বলল, 'কি নাম বললেন, স্যার? মিস্টার মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

পাসটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'তিন তলায় প্রফেসর ওয়েনের রূম, স্যার। রূম নাম্বার দুশো বারো। সোজা গিয়ে ডানে ঘুরলেই লিফট।'

'ধন্যবাদ।'

'ইউ ওয়েলকাম।'

দরজা খোলার শব্দে নাকে ঝোলানো চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তাকালেন ডেভিড ওয়েন। 'সীট ডাউন, বয়ো (বয়)।'

বসল মাসুদ রানা। প্রফেসরের সামনে রাখা একটা কাঁচের সীলড জার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। ভেতরে রয়েছে ওরই দেয়া সেই তিন চাকতির একটি—সীসার তৈরি ছোটটি।

'এই জিনিসটা কোথায় পেয়েছেন আপনি জানতে পারি কি, মিস্টার রানা?'

'গ্লাসগোয়, অ্যাকচুয়ালি। অন্য দুটো…?'

'হ্যাঁ, ওগুলোও টেস্ট করেছি। সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক ও দুটো। এটার বডিগার্ড বলতে পারেন ওদের। এটার যাতে ক্ষতি না হয়, তাই দু'পাশটা গার্ড দেয়ার জন্যে তৈরি। এমনিতে মূল্যহীন। জিনিস হচ্ছে এইটা,' চোখ নাচিয়ে জারটা দেখালেন প্রফেসর।

'জিনিস!'

'হ্যাঁ।'

'কি ওটা, প্রফেসর?'

'খাঁটি পোলোনিয়াম। কঠিন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ বিশেষ।'

ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা। আগে কখনও এ নাম শুনেছে বলে মনে করতে পারল না। 'শুনিনি কখনও এর নাম।'

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকালেন প্রফেসর। ঠোঁট ওল্টালেন। 'না শোনারই কথা। এটা খুবই বিরল এক ধাতু।'

'কি কাজে ব্যবহার হয়?'

'কখনও কখনও ওষুধ তৈরিতে লাগে, তাও খুবই কম। যার কাছে পেয়েছেন এটা, তিনি কি গ্ল্যাসগোয় কোন মেডিকেল এক্সিবিশন বা সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন?'

'জ্বি না, প্রফেসর,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'সে ধরনের কোন কিছুর সাথে তার আদৌ সম্পর্ক নেই।'

'ওয়েল, সম্পর্ক আছে এমনটি কিন্তু আমিও ভাবিনি, মিস্টার মাসুদ রানা। সেক্ষেত্রে সম্ভবত আমার আশঙ্কাটাই সত্যি।'

'আশঙ্কা' শুনেই সিধে হয়ে গেল ও। 'কি রকম?'

'এই সাইজের এক খণ্ড পোলোনিয়ামের একা কিছু করার ক্ষমতা নেই। তবে এর সঙ্গে আরেক মেটাল, লিথিয়ামের যদি সংযোগ ঘটানো

হয়, তাহলেই ওটা এক অশুভ সংবাদের কারণ হয়ে উঠবে। এ দুটো মিলিত হয়ে যা হবে, তার নাম সোজা কথায় ইনিশিয়েটর।'

'কি বললেন?'

'ইনিশিয়েটর, বয়ো।'

'কি কাজে লাগে এ জিনিস, প্রফেসর?'

'নিউক্লিয়ার বোমা ডেটোনেট করতে।'

ওইদিনই দুপুরের দিকে প্যারিস থেকে আসা ব্রিটিশ মিডল্যাণ্ড এয়ারওয়েজের একটি বোয়িং অবতরণ করল বার্মিংহামের পশ্চিমে মিডল্যাণ্ডস এয়ারপোর্টে। যাত্রীদের ভেতরে রয়েছে ডেনিশ পাসপোর্টধারী এক যুবক। আর সবার সঙ্গে কাস্টমস চেকিঙের মুখোমুখি হলো সে।

পোশাক-আশাকে বেশ স্মার্ট যুবকটি। বাঁ হাতটি তার ভাঙা, প্লাস্টার করা। কেউ যদি সন্দিহান হয়ে ডেনিশে প্রশ্ন করত তাকে, জবাব পেত অনর্গল ডেনিশে। যুবকের মা ডেনিশ, বাবা জার্মান। এ দুটো ছাড়াও রুশ এবং ইংরেজি ভাষাতেও সমান দখল যুবকের। পুব জার্মানির এরফুর্ট শহরে জন্ম। ভেতরের কথা, ওদেশের এইচভিএ ইন্টেজিলেন্স সার্ভিসের স্টাফ অফিসার সে। কেন তাকে ব্রিটেনে আসতে হয়েছে জানে না যুবক, জানার কোন ইচ্ছেও নেই।

তার ওপর যে নির্দেশ পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে সে। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন চেকিং শেষ হতে বেরিয়ে এল যুবক বন্দর ভবন থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো নিউ স্ট্রীটের মিডল্যাণ্ড হোটেল। বিমানে সারাপথ এবং অবতরণের পর চেকিঙের সময় ভাঙা হাতের সঙ্গে যাতে কারও কোন সংঘর্ষ না ঘটে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিল যুবক। এখনও আছে। ওই হাতে ভুলেও কিছু স্পর্শ করছে না সে।

হোটেল রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিল সে। তারপর কাজে লেগে পড়ল। তার ট্রাভেল ব্যাগের তলায় বসানো পেস্টবোর্ডের সাপোর্টারের ভেতর থেকে একটা পাতলা স্টীল কাটার বের করে কবজির কাছে লম্বালম্বিভাবে প্লাস্টার কাটতে শুরু করল যুবক। কাজটা শেষ হতে ভেতর থেকে 'ভাঙা' হাতটা বের করে আনল সে। কাটা কাস্টটুকু কাগজে মুড়ে ভরে ফেলল একটা প্লাস্টিক ক্যারিয়ার ব্যাগে।

সন্ধে ছয়টা পর্যন্ত রুম থেকে বের হলো না যুবক। কারণ ডে-স্টাফরা তার ভাঙা হাত হঠাৎ করে 'ভাল' হয়ে যাওয়ার রহস্য নিয়ে ধাঁধায় পড়ে যেতে পারে। রাত আটটায় বের হলো ডেনিশ। নির্দেশমত নিউ স্ট্রীট স্টেশন নিউজপেপার কিয়স্কটা খুঁজে বের করল সে অনায়াসে। নির্ধারিত সময়ে, ঠিক দশটায়, কালো লেদার জ্যাকেট ও ট্রাউজার পরা দীর্ঘ এক লোক এসে দাঁড়াল যুবকের পাশে।

বিড় বিড় করে আইডেন্টিফিকেশন কোড আওড়াল দুজনে। হস্তান্তরিত হলো প্লাস্টার কাস্টের ব্যাগ। মুহূর্তের মধ্যে নেই হয়ে গেল কালো পোশাকধারী। আশপাশের কারও চোখেই পড়ল না ব্যাপারটা।

হোটেলে ফিরে ডিনার সারল যুবক। রাত দুটোর খানিক আগে চেক আউট করল। ট্রেনে ম্যানচেস্টার এসে বিমানে চাপল। এখানে কেউ চেনে না তাকে, দেখেনি কোনদিন। অতএব অসুবিধে হলো না বিন্দুমাত্র। নিরাপদেই ব্রিটেন ত্যাগ করল ডেনিশ। প্রথমে হামবুর্গ, তারপর বার্লিন। সবশেষে চেক পয়েন্ট চার্লি হয়ে প্রাচীর পেরিয়ে ওপারে, নিরাপদ আশ্রয়ে সেঁধিয়ে গেল যুবক।

তৃতীয় চালান খুব সহজেই পৌঁছে দিতে পেরেছে সে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ ওরফে মার্টিন ফ্ল্যানারির হাতে।

ছয়

তুফানের গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে থেটফোর্ড ফিরে এল মেজর তাতায়েভ। মোটর সাইকেল গ্যারেজে রেখে পোশাক পাল্টাল সে দ্রুত। একটা হালকা রঙের স্যুট পরে রেইনকোট চাপাল তার ওপর। এরপর গ্যারেজে তালা মেরে গাড়ি চালিয়ে রওনা হলো চেরিহে'জ ক্লোজ।

যখন বাসায় পৌঁছল সে, তখন ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। ভেতরে ঢুকে দরজায় তালা লাগাল তাতায়েভ। ওপরতলায় এসে ক্লোদস্ চেস্টের নিচের ড্রয়ার খুলে হাঁটু মুড়ে বসল সামনে। সনি পোর্টেবলটা আছে ভেতরে। রেইনকোটের পকেট থেকে প্লাস্টার কাস্টের ব্যাগটা বের করে ওর পাশে রাখল সে। ব্যাগে কি আছে জানে না ভ্যালেরি। জানতে চায়ও না সে।

তাতায়েভের কাজ ওগুলো সংগ্রহ করে অ্যাসেম্বলারের হাতে তুলে দেয়া। চালান সবগুলো পৌঁছলে আসবে সে। বিছানায় যাওয়ার আগে এক কাপ চা তৈরি করল মেজর ভ্যালেরি। দুটো চালান পৌঁছেছে, আরও সাতটা পৌঁছতে হবে। মোট নয়টা। নয়টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট, নয়টা ব্যাক-আপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং আরও ছয়টা অতিরিক্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রথম চালান খোয়া গেলে ব্যাক আপ কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হবে ওগুলো আবার। বাই চান্স, তাদের ভেতর থেকেও যদি এক-আধজন ব্যর্থ

হয় কোন কারণে, তা সামাল দেয়ার জন্যেই রয়েছে শেষের এই অতিরিক্ত ছয়জন। প্রতিটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের স্থান-কাল মুখস্থ তাতায়েভের। ব্যাক আপ কুরিয়ারদের একজনের সঙ্গে মিলিত হতে হবে তাকে খুব শিগগির। দু' নম্বর বিকল্প চালান নিয়ে আসবে সে। চালানটা কেন যে পৌঁছল না, তাতায়েভের কোন ধারণা নেই সে ব্যাপারে।

তবে মস্কো ব্যাপারটা জানে। তার গ্লাসগো কনসাল সে ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে, জানিয়েছে বিস্তারিত। ওতে ডেকহ্যাণ্ড আঁদ্রেই পাভলভের 'জিনিসপত্র' যে প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনের লক আপে রয়েছে, সে বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে কনসাল মস্কোকে।

ঘুমিয়ে পড়ল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন।

টাইয়ের ঢিলে নট্ বুকের কাছে ঝুলছে। চুল এলোমেলো। ঘুমের অভাবে দু'চোখ জবা ফুলের রঙ পেয়েছে। সামনের অ্যাশট্রেতে উপচান সিগারেটের গোড়া। কার্পেট ঢাকা পড়ে গেছে কম্পিউটর প্রিন্টআউট পেপারে। ওর মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে মাসুদ রানা। অসহায়ের মত চেয়ে আছে কাগজের স্তূপের দিকে। চেহারায় রাজ্যের শঙ্কা আর হতাশা।

মূল্যবান চার চারটে দিন পেরিয়ে গেছে হাতের ফাঁক গলে, আর এক চুলও এগোতে পারেনি রানা। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। অন্য তালিকার সঙ্গে গত এক সপ্তাহে সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনে আসা কয়েক শো ইমিগ্রান্টের এনট্রি তালিকাও রয়েছে রানার সামনে। ওর মধ্যে রয়েছে ডেলিগেট, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বায়ার, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন ভাঁড়, জর্জিয়ার একদল গায়ক-গায়িকা, কোসাকের একদল নর্তক, দশজন অ্যাথলেট এবং তাদের সফরসঙ্গীরা এবং ম্যানচেস্টারে

অনুষ্ঠিতব্য একটি মেডিকেল কনফারেন্সে যোগ দিতে আসা একদল ডাক্তার।

এছাড়াও আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ট্যুর সেরে ফিরে আসা অসংখ্য ইংরেজ অ-ইংরেজ ট্যুরিস্ট। নেই কেবল অ্যারোফ্লোট ক্রু-অফিসারদের তালিকা, যারা নিত্য আসা-যাওয়া করে মস্কো-লণ্ডন-মস্কো। নেই ডেনিশ যুবকের তথ্যও, যে প্যারিস থেকে এসে বার্মিংহাম দিয়ে এদেশে ঢুকে বেরিয়ে গেছে ম্যানচেস্টার হয়ে।

এ কাজে যথেষ্ট সহায়তা করছে ওকে এয়ারপোর্ট, সী-পোর্ট ও বর্ডার পোস্ট কাস্টমস। এমনিতে ব্রিটিশ কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সব সময়ই কড়া। দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সচেতন। রানা এজেন্সির অনুরোধে আরও কড়াকড়ি আরোপ করেছে তারা এ ক্ষেত্রে। ওদের সঙ্গে প্রতিটি এন্ট্রি পয়েন্টে কম করেও দু'জন করে বিএসএস ও রানা এজেন্সির এজেন্ট রয়েছে। রানার বিশ্বাস, কোথাও বেলাইনের কিছু ঘটলে সময় মত সামাল দিতে পারবে ওরা।

এর মধ্যে রুশ ব্লকভুক্ত দেশের কয়েকজন ইমিগ্রান্টকে আটক করার মত ঘটনাও ঘটেছে। তবে তা অতিরিক্ত ডিউটি-ফ্রি কারেন্সি সঙ্গে আনার জন্যে, অন্য কোন কারণে নয়। ওদিকে ইমিগ্রেশনের হাতে কোন জাল বা ভুয়া পাসপোর্ট এর মধ্যে পড়েনি। পড়বে বলে আশাও করেনি মাসুদ রানা। কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এ ব্যাপারে যতটা ঢিলে, কমিউনিস্ট দেশগুলো ঠিক ততটাই সচেতন। দেশত্যাগ করার আগে নিজ নাগরিকদের পাসপোর্ট অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে পরীক্ষা করে দেখে ওরা। বিশেষ করে দেশটি যদি হয় ব্রিটেন।

রানার মূল দুশ্চিন্তা বিশটিরও বেশি কমার্শিয়াল সমুদ্র বন্দর, যার

ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বলতে গেলে কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। যেমন গ্লাসগো। বিদেশী নাবিকরা ইচ্ছেমত বন্দর ত্যাগ করতে পারে, যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করতে পারে। ভাগ্যিস ওখানে সেদিন একদল নেড ছিল, নইলে পোলোনিয়াম ডিস্কের টিকির সন্ধানও পেত না কেউ।

রুমের ভেতর পা রেখে থমকে গেলেন স্যার লংফেলো। ওর সঙ্গে আলোচনা করে কিছু অগ্রগতি হলো কি না জানতে এসেছিলেন। কিন্তু চেহারা দেখে সাহস হলো না মুখ খুলতে।

'আসুন, আসুন,' বৃদ্ধকে আহ্বান জানাল রানা।

'না, রানা। থাক বরং। তোমার যা অবস্থা!'

'ও কিছু নয়,' সামনের কাগজগুলো ঠেলে পাশে সরিয়ে দিল ও। 'বসুন।'

বসলেন বৃদ্ধ। এটা-ওটা নিয়ে খানিক আলোচনা হলো দু'জনে। 'কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না তো, রানা?' একসময় প্রশ্ন করলেন স্যার লংফেলো। করেই বুঝলেন, বোকার মত হয়ে গেল প্রশ্নটা। কাজটা পুরোটাই আপাদমস্তক এক মহা সমস্যা। 'মানে, ঠিক আর কি কি খুঁজতে হবে সে ব্যাপারে কোন ধারণা পেয়েছ? বলেছেন প্রফেসর ওয়েন?'

'হ্যাঁ।' ড্রয়ার থেকে একটা তালিকা বের করে এগিয়ে দিল রানা বিএসএস চীফের দিকে। 'এগুলো। অন্তত এরকমই হওয়ার কথা।'

কাগজটায় চোখ বোলালেন তিনি। 'ব্যাস?' বিস্মিত হলেন বৃদ্ধ। 'এসব দিয়েই তৈরি হবে বোমা?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'কিন্তু মুশকিল যে এসব চেনা খুব মুশকিল। গ্লাসগোর মত যদি ভাগ্য সহায়তা না করে তাহলে...।' ইচ্ছে করেই থেমে গেল ও। 'ওহ্, আরেকটা কথা।'

'বলো!'

'পুরো মিডল্যাণ্ডে কতগুলো ব্রিটিশ-আমেরিকান বিমান ঘাঁটি আছে, ওর কোন্ কোন্টায় নিউক্লিয়ার ডিভাইস আছে জানা প্রয়োজন।'

'আজই জেনে যাবে। আর কিছু?'

'এ মুহূর্তে নেই, স্যার। তবে পরে প্রয়োজন হতে পারে। আমি আসলে একটা প্যাটার্ন খুঁজছি।'

'কিসের প্যাটার্ন?'

'একই নাম্বারের পাসপোর্ট নিয়ে একাধিকবার আসা-যাওয়ার ঘটনা ঘটে কি না। অথবা এক পয়েন্ট দিয়ে ঢুকে আরেক পয়েন্ট দিয়ে কেউ বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কি না। চান্স নেই, আমিও বুঝি। তবুও আশায় আছি।'

নতুন এক ব্যবস্থা নিয়েছে রানা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বন্ধু দেশগুলো থেকে আগতরা যে পয়েন্ট দিয়েই এ দেশে প্রবেশ করুক, তাদের নাম ও পাসপোর্ট নাম্বার কম্পিউটরের মাধ্যমে সারাদেশের প্রতিটি এনট্রি ও এক্সিট পয়েন্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে সহজেই তা ঠেকিয়ে দেয়া যাবে।'

'প্রার্থনা করি সফল হও,' বিড় বিড় করে বললেন লংফেলো। 'প্রার্থনা করি ওরা যেন অন্তত আর একটা সুযোগ দেয়।'

কিন্তু মাসুদ রানাকে কোন সুযোগ দিতে রাজি নয় মেজর ক্রিপচেঙ্কো। কোন প্যাটার্নের সন্ধান দিতে চায় না সে। ক্রিপচেঙ্কোর কোন ধারণাই নেই কি পাচার করছে সে ব্রিটেনে, কি কাজে লাগবে ওগুলো। কেবল জানে, জিনিসগুলো পাঠাবার নির্দেশ আছে তার ওপর। পাঠাতেই হবে। বিফল হলে চলবে না। মোট বারোজন কুরিয়ার বাছাই করেছে সে। প্রথম নয়জনের দুটো করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, প্রাইমারি ও অলটারনেটিভ।

প্রথমবার কেউ ব্যর্থ হলে ফিরে আসবে সে, অবশ্য যদি ধরা না পড়ে। আবার ঢুকবে অন্যদিক থেকে। বাকি তিনজন স্ট্যাণ্ড বাই কুরিয়ার। প্রথম দলের কেউ কোন দুর্ঘটনায় পড়লে, ওদের পাঠানো হবে বদলি হিসেবে। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে মেজরকে, এ কাজে কোন কেজিবি রেসিডেন্টুরাকে ব্যবহার করা চলবে না। কোনমতেই না। এবং ডিরেকটরেট 'এস' যাতে ভেতরের কিছু টের না পায়, সে জন্যে তার বিভাগ থেকেও আর কোন ইল্লিগ্যালকে নেয়া যাবে না।

যে কারণে বাধ্য হয়েই প্রতিবেশীদের সাহায্য চাইতে হয়েছে ক্রিপচেঙ্কোকে। যাদের মধ্যে রয়েছে চেকস্লোভাকিয়ার এসটিবি, পোল্যাণ্ডের এসবি এবং পুব জার্মানির হপট্ ভেরওয়ালটাঙ অউয-ক্লারাঙ বা এইচভিএ। এরমধ্যে শেষেরটিই সেরা। তাছাড়া ওদের ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদও। কারণ লাখ লাখ পুব জার্মান পালিয়ে গেছে পশ্চিম জার্মানিতে, বসবাস করছে স্থায়ীভাবে। ওর মধ্যে এইচভিএ-র শ' শ' ইন প্লেস ইল্লিগ্যালসও রয়েছে। মাঝে প্রাচীর থাকলেও এথনিক জার্মানে পরিচিতি আছে ওদের। বড় একটা প্লাস পয়েন্ট ওটা।

মাত্র দু'জন রুশ নিয়েছে মেজর, বাকিদের ধার করেছে। তার জানার কোন উপায় নেই যে প্রথম দুজনের একজন, ভুয়া ডেকহ্যাণ্ড পাভলভ গ্লাসগোয় ঝাপটা পার্টির হাতে পড়ে শেষ পর্যন্ত মরে বেঁচেছে। এবং তার জিনিসপত্র প্যাট্রিক পুলিস স্টেশনে থাকলেও ওর মধ্যে আসল জিনিসটি নেই। মস্কো তাকে জানিয়েছে যে জাহাজে অতিরিক্ত মদ পানের কারণে পথেই মারা গেছে পাভলভ।

খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে মেজর ক্রিপচেঙ্কো। তার পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় সুবিধে, মাত্র তিন কুরিয়ারকে ইস্ট ব্লক ডিপারচার পয়েন্ট দিয়ে ব্রিটেনে পাঠানোর আয়োজন করেছে সে। অন্যরা যাবে যে পথে গেলে কারও কোন সন্দেহের

উদ্রেক হবে না, সে পথে।

ব্রিটিশ কাস্টমস বা ইমিগ্রেশন যাতে কোন প্যাটার্নের সন্ধান না পায়, সে-জন্যেই তার এ আয়োজন।

পরদিন। প্রাগ থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ পিয়ানো বাদক অবতরণ করলেন হিথ্রো। আলইটালিয়া ফ্লাইটে। পরদিন উইগমোর হল কনসার্টে পিয়ানো বাজানোর প্রোগ্রাম আছে তাঁর। এমন একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, কাস্টমস চটপট রেহাই দিল তাঁকে এবং তাঁর তিন সফরসঙ্গীকে।

একজন ড্রেসার; যে বাদকের পোশাক এবং সাজগোজের ব্যাপার দেখাশোনা করে। এক মহিলা সেক্রেটারি; ভক্তদের চিঠিপত্রের বোঝা সামলানো এবং তার উত্তর দেয়াসহ যাবতীয় পত্র যোগাযোগের কাজ করে সে। অন্যজন ব্যক্তিগত সহকারী। লোকটি তালগাছের মত লম্বা, লিকলিকে স্বাস্থ্য। লোকটা হোস্টদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন ও ফিনানশিয়াল ঝামেলা সামাল দেয় বাদকের।

তাঁর হোস্ট, ভিকটর হশ্‌সার অর্গানাইজেশনের একদল গুণমুগ্ধ ভক্ত যুবক-যুবতি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল বৃদ্ধকে। কাম্বারল্যাণ্ড হোটেলের নির্ধারিত সুইটে পৌঁছে দিল তাঁকে দলবলসহ। অন্যদের জন্যে সুইটের সঙ্গেই আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা আছে।

খানিক বাদে এক এক করে বিদেয় নিল গুণমুগ্ধ ভক্তরা। খানিক জিরিয়ে নেয়ার সুযোগ পেল দলের সবাই। কিন্তু রুমে আশ্রয় নিয়েও সে সুযোগ হলো না ব্যক্তিগত সহকারীর। দুশ্চিন্তায় গত কয়েকদিন থেকেই বিশ্রাম-ঘুম কোনটিই হচ্ছে না তার। সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে লোকটির দুশ্চিন্তা। যে কাজের নির্দেশ আছে তার ওপর, তা করার

আগ্রহ একেবারেই ছিল না সহকারীর। কিন্তু চেকস্লোভাকিয়ান সিক্রেট পুলিস ও ইন্টেলিজেন্স সংস্থা এসটিবি-র বিরুদ্ধাচরণ করার কথা ওদেশে কেউ কল্পনাও করে না।

ওদের দাবি না মেনে উপায় ছিল না সহকারীর। রাজি না হলে একমাত্র নাতনীটিকে প্রাগ ভার্সিটিতে ভর্তি করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে তার। সফল হবে না কোনদিনও। ওরা আশ্বাস দিয়েছে যদি সে কাজটা করে দেয়, তাহলে ওরা মেয়েটির ভর্তির ব্যাপার সামাল দেবে। বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না তাকে।

কি চাই? না, তোমার জুতোজোড়া। অবাক হলেও মনের ভাব চেপে রেখে নির্দেশ পালন করেছে সহকারী। দু'দিন পর যখন ফেরত দেয়া হলো, ও দুটো, খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে দেখেছে সে। কিন্তু আবিষ্কার করতে পারেনি কিছুই। মনে হয়েছে যেমন ছিল, তেমনই আছে তার জুতো। ওদের নির্দেশে ওই জুতো পায়ে দিয়েই লণ্ডন এসেছে সহকারী।

সন্ধের পর হোটেলের রিসেপশনে এল সুবেশি এক যুবক। মোলায়েম কণ্ঠে সহকারীর রুম নাম্বার জানতে চাইল সে। একই রকম মোলায়েম কণ্ঠে নাম্বারটা জানানো হলো তাকে কোন প্রশ্ন না করেই। ধারণা করা হলো এ নিশ্চয়ই পিয়ানো বাদকের ভক্ত, সহকারীর মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে এসেছে।

পাঁচ মিনিট পর, নির্ধারিত সময়ে দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে চমকে উঠল ব্যক্তিগত সহকারী। এ সেই সঙ্কেত। প্রথমে তিনটে, তারপর খানিক বিরতি দিয়ে আবার দুটো। লাফিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। দরজার নিচ দিয়ে কেউ এক টুকরো কাগজ ভরে দিল ভেতরে। তুলল ওটা লিকলিকে। ওতে বড় করে লেখা আছে আইডেন্টিফিকেশন কোড।

দরজা পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ উন্মুক্ত করল সে। একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা

জুতো জোড়া বের করে দিল। অদৃশ্য হাত প্রায় কেড়ে নিল ব্যাগ। দরজা বন্ধ করে বাথরুমে এসে ঢুকল সহকারী। কাগজটা কুচি কুচি করে কমোডে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিল। বুকের ভার নেমে গেছে। যতটা কঠিন হবে বলে ভেবেছিল সে, ঠিক ততটাই সহজে বিদেয় হয়েছে ঝামেলা। যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভাবল সহকারী, এবার হয়তো নাতনীটার একটা হিল্লে হবে।

মাঝরাতের দিকে ইপসউইচের বারো নাম্বার চেরিহে'জ-এ পোর্টেবল সনি ও প্লাস্টার কাস্টের পাশে স্থান পেল জুতো জোড়া। চতুর্থ চালান তার গন্তব্যে পৌঁছেছে নিরাপদেই।

কেজিবিকে কেন এত ব্যাপক এক কর্মকাণ্ড থেকে বাদ রাখলেন রুশ প্রেসিডেন্ট? ভাবছে মাসুদ রানা, কেন? এত ঝুঁকি না নিয়ে সেক্ষেত্রে সহজেই তো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পুরে পাঠানো যেত চালানগুলো! সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা থাকতেও কেন তাকে পাশ কাটালেন প্রেসিডেন্ট? লণ্ডনের রুশ দূতাবাসের উঁচু পর্যায়ে বিএসএসের সোর্স রোমানভ আছে বলে? রোমানভের ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ দেখা দিয়েছে তাঁর মনে? ওর মাধ্যমে বিএসএস খবর পেয়ে যাবে বলে?

না, তা হতে পারে না। রোমানভের ব্যাপারে এখনও কারও মনে সন্দেহ জাগেনি। জাগলে এখনও চাকরিতে বহাল থাকা সম্ভব হত না তার পক্ষে। তেমন কিছু ঘটে থাকলে হয় কৌশলে মস্কো ডেকে নিয়ে যাওয়া হত রোমানভকে, নয় কোন গুরুত্বহীন পদে বদলি করা হত, নয়ত তৃতীয় বিশ্বের কোন অখ্যাত দেশে পাঠিয়ে দেয়া হত।

মাসুদ রানা জানে, মস্কোর এলিট মহলে গত কিছুদিন ধরে ঘন ঘন পরিবর্তন চলছে। বড় বড় কর্তাদের কাউকেই এক পদে ছয় মাসের বেশি

রাখা হচ্ছে না। বিশেষ করে কেজিবির বেলায় সেন্ট্রাল কমিটির মনোভাব ভীষণ কঠোর। হাতে গোণা দু'চারজন ছাড়া প্রায় সবাইকেই গণবদলির শিকার হতে হচ্ছে। ইচ্ছেমত যখন-তখন বিদেশে অবস্থানরত কেজিবি রেসিডেন্টুরাদের ডেকে নেয়া হচ্ছে দেশে।

এর কারণ একটাই হতে পারে, ভাবছে রানা। কেজিবির বেশ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী পক্ষ বদল করেছে গত কয়েক বছরে। সংখ্যাটা আশঙ্কাজনক। সেই জন্যেই কি খেপে গেছেন প্রেসিডেন্ট ওদের ওপর? কেজিবি ছাড়াই কাজ চলবে প্রমাণ করতে চাইছেন? কিন্তু রানা যেমন জানে, তেমনি তিনিও নিশ্চয়ই অবহিত আছেন, এই দ্বীপ দেশটির ব্যাপারে যে অগাধ জ্ঞান রাখে কেজিবি, পৃথিবীর আর কোন গোয়েন্দা সংস্থা তার সিকিভাগও রাখে না।

জানালা দিয়ে দূরের অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে অন্যমনস্ক মাসুদ রানা। এ দেশের ভৌগলিক সীমারেখার বাইরে কোথাও কাজ করছে একটি চতুর মস্তিষ্ক। অসম্ভব চতুর মস্তিষ্ক। রানার মন বলছে, ট্রেস করা যাচ্ছে না বলে লোকটা কাজ বন্ধ রেখেছে এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে। ধরতে পারছে না কেউ। ধরার উপায় সে রাখেনি বলে। একের পর এক চালান পাঠাচ্ছে সে ব্রিটেনে, অত্যন্ত বিপজ্জনক চালান। ক'টা পাঠাতে পেরেছে সে এ পর্যন্ত? চারটা? পাঁচটা? নাকি ছ'টা? শেষ পর্যন্ত কি ব্যর্থই হতে হবে রানাকে?

তুমি হতে পারো ভাল, মনে মনে নিজেকে বলল রানা; কিন্তু ওই লোক আরও ভাল। সেরা। তোমার কোন চান্স নেই এ যাত্রা, মাসুদ রানা। খুব সম্ভব ব্যর্থ হতে চলেছ তুমি।

টেমসের দিকে তাকাল রানা। বাতাসে মৃদু ঢেউ উঠেছে ঘোলা পানিতে। একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকল ও।

*

আরও একজন চেয়ে আছে ঢেউয়ে দিকে। তবে টেমসের নয়, ইংলিশ চ্যানেলের। সাসেক্সের নিউহ্যাভেন পোর্টে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কালো লেদার জ্যাকেট—ট্রাউজার পরনে। পাশেই ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে আছে তার বিএমডব্লিউ। হেলমেটটা সীটের ওপর রাখা। প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি একটা ফেরিবোট দেখা যাচ্ছে, চ্যানেলের বিশাল একেকটা ঢেউ ঠেলে এদিকেই আসছে। সেদিকেই চেয়ে আছে মেজর।

ডিয়েপপি থেকে আসছে ফেরিবোট কর্নোওয়ালিস। আর এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে ঘাটে। ওটার ফোরডেকে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ উপকূলের দিকে চেয়ে আছে আন্তন যেলেস্কি। সঙ্গে নির্ভেজাল পশ্চিম জার্মান পাসপোর্ট রয়েছে তার। নামটার ভেতরে পোলিশ-পোলিশ গন্ধ। কিন্তু ও কিছু নয়, অনেক জার্মানের পোলিশ নাম আছে, জানে ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন।

প্রথম বাধা পেরিয়ে কাস্টমসের সামনে উপস্থিত হলো আন্তন যেলেস্কি। ওরা খুলে দেখল তার সুটকেস। এক বোতল জিন আর পঁচিশটি চুরুটের আনকোরা একটা বাক্স আছে ওতে। কর্নোওয়ালিসের ডিউটি-ফ্রি শপ থেকে কেনা। কাস্টমসের আপত্তি জানানোর কিছু নেই, কারণ অনুমতির বাইরে কিছু করেনি যেলেস্কি। তাকে মুক্তি দিয়ে পরেরজনকে নিয়ে পড়ল কাস্টমস।

এক প্যাকেট চুরুট ঠিকই কিনেছিল যেলেস্কি, সঙ্গে সঙ্গে তা আবার ফেলেও দিয়েছে সাগরে। ওই প্যাকেটের মত অবিকল দেখতে আরেকটা প্যাকেট সঙ্গে নিয়েই ডিয়েপপি থেকে কর্নোওয়ালিসে ওঠে সে। মাঝপথে এসে ফেরির ডিউটি ফ্রি শপ থেকে চুরুট কিনে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। তারপর সদ্য কেনা প্যাকেটের রঙচঙে লেবেলটি যত্নের সঙ্গে খুলে তা দিয়ে মুড়ে নেয় আগের প্যাকেটটি। সাগরে আশ্রয় পায় আসল চুরুটের

প্যাকেট।

স্টেশনে এসে টাইম টেবল চেক করল আন্তন যেলেস্কি। আর আধঘণ্টা পর ছাড়বে লণ্ডন এক্সপ্রেস। টিকেট কেটে এঞ্জিনের কাছাকাছি একটা ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিজে উঠে পড়ল সে। জানালার পাশে বসল আয়েশ করে। যাত্রী নেই তেমন একটা। কম্পার্টমেন্টে যেলেস্কি ছাড়া আর দু'তিনজন আছে কেবল। সময়মত ছাড়ল ট্রেন।

লুইস পৌঁছার সামান্য আগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাক পরা এক দীর্ঘ দেহ এসে দাঁড়াল তার পাশে। হাসি মুখে প্রশ্ন করল, 'গাড়িটা সোজা লণ্ডন যাবে, তাই না?'

'না,' হাসল জার্মান। 'লুইসে দাঁড়াবে শুনেছি।'

হাত বাড়াল ভ্যালেরি তাতায়েভ। সিগারের চ্যাপ্টা প্যাকেটটা তুলে দিল জার্মান। জ্যাকেটের জিপ খানিকটা নামিয়ে ওটা ভেতরে পাঠিয়ে দিল মেজর, গলা পর্যন্ত টেনে তুলল জিপ। মাথা দুলিয়ে বিদেয় জানাল, বেরিয়ে গেল কম্পার্টমেন্ট থেকে। লুইসে পলকের জন্যে আরেকবার তাকে দেখতে পেল আন্তন যেলেস্কি। রেল লাইনের সমান্তরাল রাস্তা ধরে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে উল্টোদিকে চলেছে মানুষটা। ফিরে যাচ্ছে নিউহ্যাভেন।

ইপসউইচে আগের চালানগুলোর সঙ্গে যোগ হলো চুরুটের প্যাকেট। অবলীলায় যথাস্থানে পৌঁছে গেছে পঞ্চম চালান।

সাত

অন্ধ গলিতে ঘুরে মরছে মাসুদ রানা। বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। আটদিন হয়ে গেল. কোন অগ্রগতি হয়নি কাজের। এদিকে সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। নির্বাচনী প্রচারণায় মুখর সারা ব্রিটেন। বক্তৃতা-বিবৃতি আর শোভাযাত্রায় উৎসবের রূপ পেয়েছে ছোটবড় প্রতিটি শহর। সবাই ব্যস্ত। কেউ জানে না ওরা কী ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে মাথার ওপর।

প্রতিদিন অজস্র ভ্রমণার্থী আসে এ দেশে, তাদের প্রত্যেকের আগাপাশতলা সার্চ করে দেখা অসম্ভব একটা কাজ। সে-জন্যে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ডক পুলিসের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে মাসুদ রানা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে। বিশেষ করে ইস্ট ব্লকভুক্ত দেশের নাগরিকদের ব্যাপারে। ঠিক কি খুঁজতে হবে, সে সম্পর্কে খানিকটা ধারণাও দেয়া হয়েছে তাদের।

নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করতে কি কি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন, প্রফেসর ডেভিড ওয়েনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে মাসুদ রানা। ওর একটা হবে খাঁটি ইউরেনিয়াম ব্লক, টু থার্টি ফাইভ। একটা ট্যামপার, আকার সিলিণ্ডার অথবা বলের মত, যে-কোনটা হতে পারে। এক ইঞ্চি পুরু, হাই টেনসিল হার্ডেনড় স্টীলের। তৃতীয়টা একটা স্টীল টিউব। এটাও হাই টেনসিল হার্ডেনড় স্টীলের, এক ইঞ্চি পুরু। টিউবের দৈর্ঘ্য

হতে হবে আঠারো ইঞ্চি, ওজন ত্রিশ পাউণ্ড।

রানা নিশ্চিত, এই তিনটে জিনিস অন্তত গাড়ির চেসিসে জুড়ে ব্রিটেনে ঢোকাবার চেষ্টা করা হবে। এ ব্যাপারেও কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে ওর। তাই সবগুলো বর্ডার ও ফেরিঘাটে হন্যে হয়ে জিনিসগুলো খুঁজছে কর্তৃপক্ষ। গাড়ির অংশ নয়, এমন কোন ব্লক, বল বা গ্লোব এবং সিলিণ্ডার। প্রতিটির ওজন হতে হবে অস্বাভাবিক ভারী। মানুষের ব্যাপারে শ্রেণী বিভেদ থাকলেও গাড়ির ব্যাপারে তা নেই। সে পুব ইউরোপীয়ই হোক, পশ্চিম ইউরোপীয়ই হোক, প্রতিটি গাড়িই সার্চ করা হচ্ছে। কোনও দিক থেকেই কোন খবর নেই এখনও।

বুকে জোর পাচ্ছে না রানা। স্রোতের মত প্রতিদিন আসছে-যাচ্ছে অসংখ্য গাড়ি। মোটর সাইকেল, কার, ভ্যান, ট্রাক, জাগারনাট, আরও কত কি! শুধু তৎপরতায় কাজ হবে না, মন বলছে ওর। সঙ্গে ভাগ্যের সহায়তাও চাই খানিকটা। দুটোর মিলন না হলে কোন আশা নেই।

পরদিন শনিবার, বিকেল চারটের দিকে ফেরিবোটে করে ডোভার পৌঁছল এক ক্যাম্পার ভ্যান। জার্মান রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ওটার। ভ্যানের মালিক সপরিবারে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে এসেছে ক্যালাইস থেকে। ওটার মালিক-কাম-চালক, উলফ কিগলারের সঙ্গে আছে তার স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে। ওদের কাগজপত্রে কোন খুঁত চোখে পড়ল না ইমিগ্রেশনের। সব ঠিকঠাক। কাজেই ছেড়ে দিল ওরা কিগলারকে।

ধীরগতিতে কাস্টমসের নাথিং-টু-ডিক্লেয়ার গ্রীন জোনের দিকে এগোল এবার ক্যাম্পার ভ্যান। প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে হাত তুলল এক কাস্টমস অফিসার। পাশ থেকে রানা এজেন্সির এক ওয়াচার খুঁচিয়ে দিয়েছে তাকে. কারও নজরে পড়েনি ব্যাপারটা। দাঁড়িয়ে পড়ল

ভ্যান। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখা হলো কিগলারের কাগজপত্র। তারপর ওগুলো ফেরত দিয়ে পিছনের কম্পার্টমেন্টে তল্লাশি চালানো হবে বলে জানাল অফিসার।

হাসিমুখে পাশে বসা সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকাল উলফ কিগলার। কিছু বলল। অভয় দিল সম্ভবত, কিন্তু বুঝল না অফিসার। বেরিয়ে এসে পিছনের দরজা খুলে দিল সে। ভেতরের লিভিং এরিয়ায় খেলা করছিল তাদের দুই ছেলেমেয়ে, ইউনিফর্ম পরা অফিসারকে দেখে ঘুরে তাকাল। ছেলেটি ছোট, বছর চারেক হবে বয়স। মেয়েটির বয়স ছয় বছর।

'হাই!' মিষ্টি করে হাসল অফিসার শিশু দুটির উদ্দেশে।

মেয়েটি বেশ চটপটে। উঠে দাঁড়াল বসা থেকে। 'গুটেন ট্যাগ!'

তার সোনালি চুল নেড়ে দিল অফিসার। থুতনি স্পর্শ করে আদর করল ছেলেটিকে। তারপর কাজে লেগে পড়ল। নিচে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে উলফ কিগলার ও রানা এজেন্সির ওয়াচার। প্রথমে নিজের চারদিকে নজর বোলাল অফিসার, তারপর ডানদিকের দেয়ালে ঝোলানো কাবার্ডগুলোর ভেতরটা পরখ করতে লাগল। কাপড়-চোপড় ও রান্নার ইউটেনসিল ছাড়া কিছু নেই ওখানে।

এবার ওর ঠিক নিচের লকারগুলো চেক করা হলো। একটিতে বাচ্চাদের কিছু খেলনা রয়েছে। দুটো পুতুল, একটা টেডি বেয়ার, চার-পাঁচটা রঙচঙে নরম রাবারের বল ইত্যাদি। ছুটে এসে ভেতর থেকে একটি পুতুল বের করে নিল মেয়েটি, ওটা নাচিয়ে উত্তেজিত স্বরে কিছু বলতে লাগল অফিসারকে।

'ওহ্, বিউটিফুল!' আবার তার চুল নেড়ে দিল লোকটা। লাফিয়ে নেমে পড়ল ভ্যান থেকে। 'অল রাইট, স্যার,' মাথা ঝাঁকাল অফিসার জার্মানের উদ্দেশে। 'এনজয় ইওর হলিডে।'

'ড্যাঙ্কি!'

গড়িয়ে গড়িয়ে শেড থেকে বেরিয়ে এল ক্যাম্পার ভ্যান। এগিয়ে চলল ডোভার শহরের দিকে। শহর হয়ে লণ্ডন যাওয়ার ইচ্ছে কিগলারের। তার স্ত্রী ম্যাপ দেখে দেখে নির্দেশ দিচ্ছে, সেই মত গাড়ি চালাচ্ছে সে। এর মধ্যে কয়েকবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়েছে কিগলার। দেরি করে ফেলেছে সে। কিন্তু কিছু করার নেই। তার ওপর নির্দেশ ছিল কোনমতেই স্পীড লিমিট অতিক্রম করা যাবে না।

আধঘণ্টা চলার পর চ্যারিঙ গ্রামে পৌঁছল ভ্যান। মেইন রোডের ডানদিকে। গ্রামের শেষ মাথায় দেখা গেল বড় একটি সাইনবোর্ড—হ্যাপি ঈটার ক্যাফেটেরিয়া। স্টিয়ারিঙ ঘোরাল কিগলার, প্রায় শূন্য কার পার্কে দাঁড় করাল ভ্যান। বাচ্চাদের নিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে ঢুকল মিসেস কিগলার। এদিকে মিস্টার নির্দেশমত এঞ্জিন কভার তুলে লেগে পড়ল 'কাজে'। মিনিটখানেক পর অপরিচিত এক কণ্ঠ শুনে ঘুরে তাকাল সে। রাইডার'স লেদার ড্রেস পরা এক যুবক দাঁড়িয়ে।

'এঞ্জিনে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে?' প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'হ্যাঁ। মনে হয় কারবুরেটরে কিছু একটা হয়েছে।'

'না,' মাথা দোলাল মোটর সাইক্লিস্ট। 'গোলমালটা ডিস্ট্রিবিউটরে। দেরি করে ফেলেছেন আপনি।'

'দুঃখিত। ফেরি, কাস্টমস সবাই মিলে দেরি করিয়ে দিল। আসুন।'

ভ্যানে এসে উঠল সে তাতায়েভকে নিয়ে। খেলনার লকার থেকে একটা বল বের করে তুলে দিল তার হাতে। 'এই যে।'

পাঁচ ইঞ্চি ডায়া বলটার, কিন্তু তার ওজন অবিশ্বাস্য। প্রায় বিশ কিলোগ্রাম বা চুয়াল্লিশ পাউণ্ড। হতেই হবে, কারণ ওটার রাবারের আবরণের ভেতর লুকিয়ে আছে আসল জিনিস। খাঁটি ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ। যার ওজন সীসার দ্বিগুণ। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে বলটা ভরল তাতায়েভ।

ভ্যান থেকে নেমে পার্কের ও প্রান্তে রেখে আসা বিএমডব্লিউর দিকে চলল। প্রচণ্ড শক্তি খাটাতে হচ্ছে তাতায়েভকে ওটা হাতের তালুতে করে বয়ে নিয়ে যেতে, মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখতে। সবাইকে সে বোঝাতে চাইছে যে জিনিসটা তেমন কিছু নয়। যদিও বোঝার জন্যে কেউ তাকিয়ে নেই তাতায়েভের দিকে।

কভার নামিয়ে দ্রুত ক্যাফেতে ঢুকে পড়ল উলফ কিগলার। ওদিকে পিছনের ফাইবার গ্লাস বক্সে জিনিসটা রেখে মোটর সাইকেল স্টার্ট দিল মেজর ভ্যালেরি। মেইন রোডে উঠে তুমুল গতিতে ডার্টফোর্ড টানেলের দিকে ছুটল। টানেল অতিক্রম করে সাফোক। সেখান থেকে লণ্ডন হয়ে ইপসউইচ। সুদীর্ঘ সফর। রাস্তা ছেড়ে শূন্যে ভাসছে প্রায় বিএমডব্লিউর দুই প্রশস্ত চাকা, উড়িয়ে নিয়ে চলেছে প্রভুকে।

ভাইজরের ভেতর দিয়ে স্থির চোখে সামনে তাকিয়ে আছে মেজর তাতায়েভ। নিরুদ্বিগ্ন, প্রশান্ত চেহারা। শিস দিয়ে গান গাইছে।

নিজেকে পরাজিত সেনাপতির মত নিঃস্ব, অসহায় মনে হচ্ছে মাসুদ রানার। এত বড় একটা বাহিনী, এত ব্যাপক আয়োজন সব বেকার হতে বসেছে। সব ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢোকা অব্যাহত রয়েছে শত্রুর। জানে, অথচ কিছুই করতে পারছে না ও। অন্ধের মত শিকার করতে নেমেছে রানা। দেখতে না পেলেও ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে শিকারের উপস্থিতি।

কিন্তু এর বেশি কি-ই বা করতে পারে রানা? কি করার আছে? কম্পিউটর প্রিন্টআউটের পাহাড় কোন আশার আলো দেখাতে পারেনি এখন পর্যন্ত। কোন প্যাটার্নের সন্ধান পায়নি রানা ওর মধ্যে। কোন ইস্ট ব্লক নাগরিক একবারের বেশি প্রবেশ করেনি ব্রিটেনে, কোন পাসপোর্টও একবারের বেশি ব্যবহৃত হয়নি।

কিছু কিছু অনিয়ম যে ঘটেনি, তা নয়। ঘটেছে। কিন্তু তার সঙ্গে রানার কাঙ্ক্ষিত অনিয়মের কোন সংযোগ নেই। কয়েকবার করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সেগুলো, রুমে নিয়ে আলাদাভাবে লাগেজ তো বটেই, প্রায় উলঙ্গ করে সার্চ করা হয়েছে ওর বাহকদের। কিন্তু ফলাফল শূন্য। এসব হিথ্রোর ঘটনা। লণ্ডনের বাইরেও এ ধরনের তিনটে ঘটনা ঘটেছে গত দু'দিনে।

এমআই ফাইভের মতে তিনজনই আমেরিকান আণ্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার। জুয়া এবং মাদক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ওদেশের পুলিসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে আশ্রয় পাওয়ার আশায়। ঘাড় ধরে পরবর্তী বিমানে তুলে দেয়ার আগে তাদেরও একই কায়দায় সার্চ করেছে ইমিগ্রেশন-কাস্টমস। বিএসএসের অনুরোধে সিআইএ ওদের পরিচয় ও কীর্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে। এমআই ফাইভের রেকর্ডের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই তাতে।

কোন কিছু কি নজর এড়িয়ে যাচ্ছে ওর? ভাবল মাসুদ রানা। বিশেষ কিছু? নতুন করে ভাবতে বসল ও, আর কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া যায় এর বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে চেষ্টা বাদ দিল রানা। ঠিক পথেই এগোচ্ছে ও, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

মন বলে, একটা না একটা সুযোগ শেষ পর্যন্ত পাবেই ও। কোথাও না কোথাও ছোট্ট একটা ভুল করবেই চতুর ব্রেনটি। করবেই।

চেরিহে'জ ক্লোজ। ইপসউইচ। একটা শক্তিশালী পোর্টেবল রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। তার জন্যে নির্ধারিত ব্যাণ্ডে মস্কো রেডিওর কমার্শিয়াল শুনছে সে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে। বড়সড় একটা ব্রাউন সেট, ক'দিন আগে স্টোমার্কেট থেকে কিনেছে তাতায়েভ। পৃথিবীর প্রায় সব চ্যানেলই ধরে এটায়।

তাতায়েভ বেশ চিন্তিত। দু'নম্বর চালান পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ সময় মতই মস্কোকে জানিয়েছে সে। কথা ছিল, সেরকম কিছু ঘটলে মস্কোকে কেবল অবহিত করতে হবে তা। এরপর প্রতিদিন রাত বারোটা থেকে পরবর্তী পনেরো মিনিট অথবা প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে সোয়া একটা পর্যন্ত এই বিশেষ ব্যাণ্ড শুনতে হবে তাকে। নিজের কাজে গাফিলতি নেই তাতায়েভের।

রাতে সম্ভব না হলে দিনের নির্ধারিত সময় রেডিওর সামনে কাগজ কলম নিয়ে বসে থাকে সে। এক দিনও বাদ দেয়নি। কিন্তু উত্তর এল না আজও। বিকল্প চালান হাতে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না সে।

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার হঠাৎ। আসছে! উত্তর আসছে, কল সাইন শুনতে পেয়েছে সে। ঘড়ি দেখল তাতায়েভ—বারোটা দশ। কলম তুলে নিল তাতায়েভ। প্রস্তুত। পর পর দু'বার কল সাইন, তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে শুরু হলো সঙ্কেত বার্তা। মোর্স সঙ্কেত। ঝটপট লিখে ফেলল সে ওটা, সরাসরি ইংরেজিতে।

তাতায়েভ নিশ্চিত, ব্রিটিশ, মার্কিন এবং জার্মান লিসনিং পোস্টগুলোও এতক্ষণে লিখে নিয়েছে বার্তাটা। কিন্তু তাতে চিন্তার কিছু নেই। কোড জানা না থাকলে এ আর কারও পক্ষে ডিসাইফার করা কোনমতেই সম্ভব নয়। সেট অফ করে ওয়ান টাইম প্যাড নিয়ে লেগে পড়ল ভ্যালেরি তাতায়েভ। পনেরো মিনিট ব্যয় হলো তার বার্তার অর্থ উদ্ধার করতে। যা এরকম ঃ ফায়ারবার্ড টেন রিপ্লেসিং টু আর ভিটি।

আর ভি অর্থ রঁদেভু। টি বিশেষ একটি স্থানের নাম। একটা এয়ারপোর্ট হোটেল। হোটেল পোস্ট হাউস, হিথ্রো। ঝামেলা! ভাবল তাতায়েভ। কুরিয়ার দশ এবং সাতের সঙ্গে খুব কম সময়ের ব্যবধানে সাক্ষাৎ করতে হবে ওকে। প্রথমটির সঙ্গে সকাল সাতটায়, হিথ্রোয়, এবং সাতের সঙ্গে সকাল এগারোটায়। কলচেস্টারে।

এর মধ্যে এত পথ অতিক্রম করা কঠিন হবে। তবে পঙ্খিরাজটির ওপর বেশ আস্থা আছে ভ্যালেরি তাতায়েভের। ঠিক সময় জায়গামত গিয়ে হাজির হতে পারবে সে, নিজেকে আশ্বস্ত করল মেজর। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, ঠিক চারটের সময় ঘুম ভাঙা চাই। কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করল তাতায়েভ, কানের ভেতর দিয়ে অবচেতন মনে পৌঁছে দিল বার্তাটা। মুহূর্তে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমের কোলে। ডান হাত বালিশের নিচে, আলতো করে ধরে রেখেছে সাকো অটোমেটিক।

কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় ঘুম ভাঙল তার। হালকা নাশতা এবং এক কাপ চা খেয়ে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল তাতায়েভ। পোস্ট হাউস হোটেলে পৌঁছল সে ছয়টা পঁয়তাল্লিশে। মোটর সাইকেল পার্ক করে লেদার জ্যাকেট ও জিপ সাইডেড ট্রাউজার খুলে ফেলল ভ্যালেরি। নিচে সাধারণ ফ্ল্যানেলের স্যুট পরেই এসেছে। এক পেনিয়ারে ওগুলো ভরল সে। ওটা বন্ধ করে দ্বিতীয়টা খুলে বের করল একজোড়া জুতো। জ্যাকবুট খুলে ওটায় ভরে রাখল, পায়ে দিল জুতো।

পা বাড়াল হোটেল রিসেপশনের দিকে।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি লুইস্ ইয়ারজেলস্কির। কারণ দীর্ঘ চাকরি জীবনে গতকাল সন্ধেয় প্রথম বড় ধরনের একটা ঝাঁকি খেতে হয়েছে তাকে। এমনটি ঘটতে পারে কখনও চিন্তাই করেনি সে। পোলিশ বিমান সংস্থা 'লট'-এর সিনিয়র স্টুয়ার্ড ইয়ারজেলস্কি। হিথ্রোর ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসে্র সবার খুবই পরিচিত সে। আগে কখনও তার ব্যাগেজ খুলেও দেখেনি ওরা।

কিন্তু কাল দেখেছে। শুধু তার নয়, প্রত্যেকের। তাও আবার যেমন-তেমন দেখা নয়। ব্যাগের সবকিছু বের করে, ফেলে-ছড়িয়ে বিচ্ছিরি এক

কাণ্ড করেছে ওরা। পরিচিত বলে খাতির করেনি বিন্দুমাত্র। তারওপর একেকজনের সে কী চাউনি! সে সময়ে ইয়ারজেলস্কির বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল যে লোকগুলো ওর অনেকদিনের চেনা, এবং তাকেও খুব ভাল করে চেনা আছে ওদের।

কাস্টমসের একজন যখন হাত ঢুকিয়ে দিল তার ব্যাগে, ইয়ারজেলস্কির মনে হলো যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। মুহূর্তে মুখ ভরে উঠেছিল টক টক পানিতে। খানিক পর যখন আসল জিনিস বের করল লোকটা, মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল সে আরেকটু হলে। ওটা ছিল একটা ইলেক্ট্রিক রেজর। ওয়ারশ ত্যাগ করার ঘণ্টাখানেক আগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা ভরে দিয়েছিল তার ব্যাগে। ওটা নিয়ে কি করতে হবে লণ্ডন পৌঁছে, তাও তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ভাগ্য ভাল যে জিনিসটা ব্যাটারি চালিত বা রিচার্জেবল্ মডেলের নয়। এবং ধারেকাছে কোন প্লাগ পয়েন্টও ছিল না যে চালু করে ওটার কার্যকরিতা পরীক্ষা করে দেখবে লোকটা। ওই জন্যেই বেঁচে গেছে লুইস ইয়ারজেলস্কি। নইলে হয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা, দেখতে রেজরের মত হলেও ওটা আদৌ তা নয়। অন্ করা হলে ঠিকই ধরে ফেলত কাস্টমস যে একটা কিছু গণ্ডগোল আছে ওটায়।

ঠিক সাতটায় রিসেপশনে ঢোকার আগে, হাতের বাঁ দিকে, হোটেলের পাবলিক বাথরুমে ঢুকল এসে সিনিয়র স্টুয়ার্ড। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যানেলের স্যুট পরা এক ইংলিশম্যানকে হাত ধুতে দেখে কপাল কোঁচাকাল সে। ড্যাম! কন্ট্যাক্ট যদি এসে পড়ে এখন, ও ব্যাটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে। কি করবে ভাবছে ইয়ারজেলস্কি, এই সময় কথা বলে উঠল ইংলিশম্যান।

'মর্নিং। আপনার ইউনিফর্মটা কি ইয়োগোস্লাভ এয়ারলাইনের?'

চমকে গেলেও নিজেকে সামলে নিল স্টুয়ার্ড দ্রুত। স্বস্তির নিঃশ্বাস

ছেড়ে বলল, 'না। এটা পোলিশ ন্যাশনাল এয়ারলাইনের।'

'দারুণ এক দেশ পোল্যাণ্ড,' হাত মুছতে মুছতে বলল যুবক। কোনরকম টেনশনের বালাই নেই তার মধ্যে। হাসি হাসি, অত্যন্ত সপ্রতিভ চেহারা। 'কিছুদিন ছিলাম আমি আপনাদের দেশে। বড় সুখের ছিল দিনগুলো।'

বড় সুখের ছিল দিনগুলো, আপনমনে মাথা দোলাল ইয়ারজেলস্কি। ঠিক এই কয়টা শব্দই শুনতে চাইছিল সে। রেজরটা বের করে এগিয়ে দিল যুবকের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই থতমত খেয়ে গেল তাকে কটমট করে তাকাতে দেখে। চট্ করে ফিরিয়ে নিল হাত। মাথা দুলিয়ে তাকে একটা দরজা বন্ধ বুদ দেখাল যুবক। বুঝে ফেলল স্টুয়ার্ড। ওর ভেতরে কেউ আছে, তাই সতর্ক হতে বলছে।

মুখ ঘুরিয়ে যে ওয়াশবেসিনের সামনে সে দাঁড়িয়ে, সেটার কাঁচের শেলফটা দেখাল ইংলিশম্যান। ওর ওপর রাখতে বলছে সে জিনিসটা। তাই করল স্টুয়ার্ড। এবং যুবকের আরেক চোখে শাসানি ও ইঙ্গিত দেখে তাড়াতাড়ি প্যান্টের জিপ্ খুলে দাঁড়িয়ে গেল ইউরিনালের সামনে। পাঁচ আঙুল তুলে দেখাল যুবক। অর্থাৎ পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলছে তাকে এখানে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ইয়ারজেলস্কি। বলল, 'ধন্যবাদ। পোল্যাণ্ড সত্যিই খুব সুন্দর দেশ।'

কথাটা শোনেনি বোধহয় যুবক, ভাবল স্টুয়ার্ড। তার আগেই রেজর নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে এম টুয়েলভ মোটরওয়েতে পৌঁছে গেল তাতায়েভ। উড়ে চলেছে উত্তর-পুব লণ্ডনের এসেক্স কাউন্টি বর্ডারের দিকে। আটটা বেজে কয়েক মিনিট তখন।

হারউইচের পার্কস্টোন কী-র জেটিতে এসে ভিড়ল 'টর ব্রিটানিয়া' ফেরি।

ওটা গোথেনবার্গ থেকে এসেছে। এ ফেরির যাত্রী সাধারণত ট্যুরিস্ট, ছাত্র, কমার্শিয়াল ভিজিটর। ওটা ভিড়তে দল বেঁধে নেমে এল সবাই। ওর মধ্যে স্টিগ লাণ্ডভিস্ট নামে এক কমার্শিয়াল ভিজিটর রয়েছে। নিজের স্যাব সেলুন কার নিয়ে এসেছে লোকটি।

তার কাগজপত্র বলছে সে একজন সুইডিশ ব্যবসায়ী। কথাটা মিথ্যে নয়। একদম সত্যি। আরও সত্যি যে সে একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট এজেন্ট। কথাটা অবশ্য কাগজপত্রে উল্লেখ করতে ভুলে গেছে সে দেশের কর্তৃপক্ষ। আসলে জানার কোন উপায় নেই যে স্টিগকে কমিউনিস্ট পার্টির অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে সুইডিশ সরকার অনেক আগেই। এবং পুলিসের তাড়া খেয়ে পুব জার্মানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। বর্তমানে এইচভিএ-র এজেন্ট সে।

গাড়ি থেকে নামার অনুরোধ করা হলো তাকে। বলা হলো সঙ্গের লাগেজ নিয়ে এক্সামিনেশন বেঞ্চে আসতে। তাই করল স্টিগ লাণ্ডভিস্ট। মুখে অমায়িক হাসি। এদিকে তার লাগেজ চেকিঙ চলছে, ওদিকে আরেক কাস্টমস অফিসার গিয়ে তার সেলুনের এঞ্জিন কভার তুলে ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা দেখতে লাগল। একটা চকচকে স্টীলের বল বা রডের মত দেড় ফুট দীর্ঘ পাইপ ধরনের কিছু একটা খুঁজছে সে। এঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের ভেতর কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকতে পারে জিনিসগুলো। কিন্তু নেই।

এবার গাড়ির তলা দেখল লোকটা। তারপর পিছনের বুট। সাধারণ টুল কিট্ এবং একটা ছোট ফায়ার এক্সটিঙগুইশার ছাড়া ওখানেও কিছু নেই। ব্যাগেজ তল্লাশি শেষ সুইডিশের। স্যুটকেস দুলিয়ে হৃষ্টচিত্তে গাড়ির কাছে ফিরে এল সে।

'সব ঠিক আছে, অফিসার?' বিনয়ী কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ, স্যার। এনজয় ইওর স্টে।'

এক ঘণ্টা পর কলচেস্টারের দক্ষিণে লেয়ের-ডি-লা-হে নামে খুদে এক গ্রামে কিংস ফোর্ড পার্ক হোটেলের কার পার্কে এসে থামল স্টিগ লাণ্ডভিস্টের স্যাব সেলুন। মিড মর্নিং কফি পানের সময় এটা। পার্কে বেশ কিছু গাড়ি রয়েছে। তবে মানুষ নেই কোনটিতে। সবাই ভেতরে পানাহারে ব্যস্ত।

ঘড়ি দেখল লাণ্ডভিস্ট। সময় হয়নি এখনও। আরও পাঁচ মিনিট বাকি। তবে ওই সময়েই যে মুক্তি পাবে সে এমন কোন কথা নেই। ওর পরেও পাক্কা এক ঘণ্টা সময় থাকবে চূড়ান্ত সময়সীমায় পৌঁছতে। যদি লোকটা তার মধ্যে আসে, ভাল। নইলে নতুন স্থান, নতুন সময় নির্ধারণ করে দেবে হউপট ভেরওয়ালটাঙ অউফক্লারাঙ।

লোকটা কি আসবে? আপনমনে ভাবছে লাণ্ডভিস্ট, কখন আসবে? চারদিকে ভাল করে তাকাল সে আবার। পিছনদিকে, পার্কের একেবারে ও প্রান্তে এক মোটর সাইক্লিস্টকে দেখতে পেল সুইডিশ, স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করাচ্ছে নিজের বিশাল বিএমডব্লিউ। মুখ ঘুরিয়ে সিগারেট ধরাল লাণ্ডভিস্ট। যার আসার কথা, সে দেখতে কেমন জানা নেই তার।

. কেমন লোকটা? কোন দেশী? ঠিক এগারোটায় কাঁচের জানালায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনে চমকে ঘুরে তাকাল ব্যবসায়ী। মোটর সাইক্লিস্ট! বোতাম চেপে কাঁচ নামিয়ে দিল সে।

'আপনার নাম্বার প্লেটের "এস" কি সুইডেন মীন করে? না, সুইটজারল্যাণ্ড?' প্রশ্ন করল আগন্তুক।

চওড়া হাসি ফুটল লাণ্ডভিস্টের মুখে। বাঁচলাম! 'সুইডেন। গোথেনবার্গ থেকে আসছি আমি।'

'যাইনি কখনও ওদেশে।'

আসন ছাড়ার প্রয়োজন হলো না ব্যবসায়ীর। আসল জিনিস, অগ্নি

নির্বাপক যন্ত্রটা এখানে পৌঁছার আগে পথে গাড়ি থামিয়ে পাশের সীটে এনে রেখেছিল সে একটা হেসিয়ান ব্যাগে পুরে। ব্যাগটা চালান করে দিল সে ঝটপট। পেনিয়ারে ভরল তাতায়েভ ওটা। এক ঘণ্টা পর থেটফোর্ডে নিজের লক্ আপ গ্যারাজে পৌঁছল সে। চালান দুটো ফ্যামিলি সেলুনের বুটে ভরে ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল ইপসউইচের পথে।

বিকেল তিনটের দিকে আগেরগুলোর সঙ্গে ক্লোদস চেস্টে স্থান পেল দুইয়ের বিকল্প দশম ও সপ্তম চালান।

অসটেণ্ড থেকে দীর্ঘ যাত্রা সেরে ফকস্টোন জেটিতে ভিড়তে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন বোঝার ভারে ডুবু ডুবু 'কুইন এলিজাবেথ'। পায়ে হাঁটা ট্যুরিস্টের দঙ্গল ও হালকা গাড়ির ভারমুক্ত হতে সময় লাগল এক ঘণ্টারও বেশি। এরপর রয়েছে অসংখ্য দৈত্যাকার টিআইআর জাগারনাট। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, ইইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কার্গো বহন করে এগুলো।

ওর মধ্যে সাতটা জার্মানিতে রেজিস্টার্ড। প্রচণ্ড শক্তিধর হ্যানোমাগ রিগ, পিছনে বিশ ফুট দীর্ঘ কন্টেইনারবাহী আঠারো চাকার ট্রেইলার। প্রতিটির ক্যাবের পিছনে, দু পাশে দুটো করে ভার্টিক্যাল এগজস্ট পাইপ রয়েছে আকাশমুখি। এঞ্জিনের গর্জনের সঙ্গে তাল রেখে ধোঁয়া ছুঁড়ছে ওপরে। একেকটা ছাড় করাতে পনেরো বিশ মিনিট করে ব্যয় হলো। ব্রিটিশ ব্রেকফাস্ট টেবিলের জন্যে তৈরি জার্মান কফি মেশিন নিয়ে এসেছে ওগুলো।

হুঙ্কার ছেড়ে কাস্টমস শেড থেকে এক এক করে বেরিয়ে এল জাগারনাটগুলো। রওনা দিল অ্যাশফোর্ড হয়ে লণ্ডনের পথে। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, ওরই একটার এগজস্ট পাইপের ভেতরে, তলার দিকে

ফিট্ করা আছে আরেকটা বাই-পাস পাইপ। হিট্ প্রুফ কাপড়ের প্যাড দিয়ে মোড়া। আঠারো ইঞ্চি লম্বা ওটা, অবিশ্বাস্য ওজন।

রাত ন'টার দিকে কেন্টের লেনহ্যাম পৌছল রিগটা। রাস্তার পাশে ওটা দাঁড় করিয়ে ক্যাবের ছাদে উঠে এল ড্রাইভার। এগজস্ট পাইপ ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল সে, তারপর ভেতরে হাত চালিয়ে বের করে আনল প্যাড মোড়া পাইপটা। একটু পরই এল সে আঁধার ফুঁড়ে। কালো পোশাক পরা এক মোটর সাইক্লিস্ট। দু'চারটা বাক্য বিনিময় হলো দুজনের। তারপর পাইপটা তার হাতে তুলে দিল জাগারনাট চালক।

আট নম্বর চালান ছিল ওটা।

দু'হাতে রুক্ষ চুল মুঠো করে ধরে বসে আছে মাসুদ রানা। মুখ নিচু করে ফ্লোরের দিকে চেয়ে আছে। গর্তে বসে যাওয়া লাল চোখের দৃষ্টি খ্যাপাটে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সব মিলিয়ে উদভ্রান্ত চেহারা। মেজর ন্যাশনাল অ্যালার্ট ঘোষণা ছাড়া ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস যতদূর সম্ভব করছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই ওর।

ওদেরও এরচেয়ে বেশি কিছু করার নেই। ট্যুরিস্ট ও যানবাহনের নিত্য স্রোত ঠেকিয়ে দিয়ে যদি থরো সার্চের নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন হয় কখনও, সেক্ষেত্রে মেজর ন্যাশনাল অ্যালার্ট ঘোষণা করার নিয়ম আছে, যা জরুরী অবস্থার পর্যায় পড়ে। তেমন কিছু করতে গেলে প্রাণস্পন্দন থেমে যেত দেশের। কারণ রোজ যে পরিমাণ ট্যুরিস্ট চারদিক থেকে ব্রিটেনে প্রবেশ করে থাকে, তা রীতিমত বিস্ময়কর।

ওই জাতীয় কিছু করতে গেলে সামরিক বাহিনীকেও পথে নামাতে হত। কিন্তু মাসুদ রানা তা চায়নি। গোপন সূত্রে পাওয়া হুমকির মোকাবেলা করতে চেয়েছিল ও গোপনেই। কিন্তু ব্যর্থ হতে বসেছে ওর

পরিকল্পনা। নাকি হয়েই গেছে? সবগুলো চালান ঢুকে পড়েছে এরই মধ্যে? অনুশোচনা হচ্ছে এখন ওর। কেন এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে গেল?

আশঙ্কা হচ্ছে, সর্বনাশটা বুঝি শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারবে না রানা। ওর অনুরোধে মিডল্যাণ্ডের সবগুলো ইঙ্গ-মার্কিন বিমানঘাঁটির তালিকা ম্যাপ ইত্যাদি সেদিনই যোগাড় করে দিয়ে গেছেন স্যার লংফেলো। তিনটে ঘাঁটি আছে। রেনডেলহ্যাম ফরেস্ট, ওয়াঙফোর্ড ও সেইন্ট এডমাণ্ডস্-এ। এর যে কোন একটিই মস্কোর নিশানা। কিন্তু কোনটি? ধরা যাক, রেনডেলহ্যাম ঘাঁটি। কিন্তু যে ঘটাবে কাজটা, সে কোথায় লুকিয়ে আছে কি করে বুঝবে মাসুদ রানা? লোকটি যে কে, তাও তো জানতে হবে।

এতদিন এসব নিয়ে ভাবেনি ও। মনে করেছিল কয়েকটা চালান আটকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে কেজিবির স্পাইটিকে। ব্যর্থ হয়ে এক সময় বাধ্য হয়েই দেশে ফিরে যেতে হবে তাকে। কিন্তু তা বোধহয় আর হলো না। যতই নিজেকে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করুক, মন মানছে না। দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে আছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রথমে রাহাত খান ও পরে মাসুদ রানাকে কথা দিয়েছিলেন এ নিয়ে তেমন কোন উচ্চবাচ্য করবে না ব্রিটেন। সে যে ভেতরের ব্যাপার টের পেয়ে গেছে, বুঝতেই দেবে না মস্কোকে। তারপর নির্বাচন শেষ করেই টপাটপ্ জেলে পোরা হবে লেবার পার্টির লেফ্টিস্ট উইঙের মাথাগুলোকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ করেই বেজে উঠল টেলিফোন। মুখ তুলল মাসুদ রানা। রিসিভার কানে লাগাল। 'ইয়েস?'

'রানা!'

দূরাগত ভরাট কণ্ঠের ডাকটা দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি

করল ওর। ঝট্ করে সিধে হয়ে বসল রানা। 'স্যার!'

'রানা! কেমন আছ তুমি?' অদ্ভুতরকম নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'না, স্যার। ভাল না।'

'আমি বুঝি। ভাল কোন খবর হলে তুমি নিশ্চয়ই জানাতে আমাকে।'

'এখনও কিছুই করতে পারলাম না, স্যার,' কণ্ঠে হতাশা চাপা থাকল না রানার।

'রানা, তুমি কি হাল ছেড়ে দিয়েছ?' প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ চাবুকের মত সপাং করে আছড়ে পড়ল যেন কানের পর্দায়। টের পেল রানা, বৃদ্ধের কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে উঠেছে।

'জ্বি না, স্যার। কিন্তু...'

'হাল ছেড়ো না, রানা। হতাশ হয়ো না। তোমার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমার। আমি জানি তুমি পারবে। তুমি ন্যায়ের পক্ষে আছ, ওরা অন্যায়ের পক্ষে। কথাটা মনে রাখবে প্রতি মুহূর্তে। বুকে বল পাবে তাহলে। মনের জোর বেড়ে যাবে,' ঠিক যেন কোন বাচ্চা ছেলেকে পরীক্ষার আগে আদর করে মন দিয়ে লেখাপড়া করার ব্যাপারে বোঝানো হচ্ছে, এমনভাবে বললেন তিনি কথাগুলো।

'জ্বি, স্যার।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, বুঝলে? সমস্যার বিরুদ্ধে আঁটঘাট বেঁধে লাগতে পারলে ভয় পেয়ে সমস্যাই পিছিয়ে যায়। লেগে থাকো। কাজ হবে। হতেই হবে কাজ।'

আশ্চর্য! ভেতরের সমস্ত হতাশা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। মনের জোর হাজার গুণ বেড়ে গেল রানার। 'জ্বি, স্যার। লেগে আছি আমি। সুযোগের অপেক্ষায় আছি।'

'গুড! এখন রাখি তাহলে। দোয়া করি, সফল হও।'

আট

ওইদিনই অন্তরের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো মাসুদ রানার। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হলো সুযোগ।

ভিয়েনা থেকে ছেড়ে আসা অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইনসের একটি বিমান হিথ্রো অবতরণ করল বিকেল চারটে দশে। নিয়ম অনুযায়ী ইমিগ্রেশন ডেস্ক অতিক্রম করতে লাগল যাত্রীরা। তিনটে ইমিগ্রেশন ডেস্ক। একটা ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্যে, একটা ইইসি দেশসমূহের নাগরিকদের জন্যে এবং শেষেরটা নন্-ইউকে, নন্-ইইসি ডেস্ক।

শেষ ডেস্কটির সামনে এসে দাঁড়াল এক মাঝবয়সী লোক। আটত্রিশ-চল্লিশ বছর হবে বয়স। লম্বা পাঁচ ফুট আট। নীল চোখ। খাঁজ কাটা থুতনি। চেহারা সুরত সব মিলিয়ে মন্দ নয়। কিন্তু ঝামেলা বাধিয়েছে চুল। ভীষণ পাতলা মাথার চুল। খুলির প্রায় পুরোটাই দেখা যায় ওর ভেতর দিয়ে। একটা গ্রিপ ছাড়া আর কোন লাগেজ নেই তার সঙ্গে।

তার পাসপোর্টের ওপর শকুন দৃষ্টি বোলাতে আরম্ভ করল ইমিগ্রেশন অফিসার। লোকটাকে কেন যেন পছন্দ হয়নি তার। পরিচিত নীল প্লাস্টিক মোড়া পাসপোর্ট। ওপরে এমব্লেম্ করা সোনালি ঈগল। বেশিদিন হয়নি ইস্যু করা হয়েছে। কভার ওল্টাল অফিসার। ফ্রানজ ওসনিয়াক লোকটার নাম। পেশা ব্যবসা। পাসপোর্টের নাম্বারটা সামনের কম্পিউটরে ফিড

করল অফিসার।

কিছু একটা ঘটে গেল ডিসপ্লে স্ক্রীনে। শক্ত হয়ে গেল অফিসার। যদিও ওসনিয়াককে টের পেতে দিল না সে কিছু। বরং সন্তুষ্ট হওয়ার ভান করে মাথা দোলাল। 'ধন্যবাদ, স্যার। আনন্দের হোক আপনার ব্রিটেন সফর। নেক্সট, প্লীজ!'

ওসনিয়াক সামনে থেকে সরে যেতেই মুখ তুলল অফিসার। সরাসরি সামনের দিকে তাকাল। দশ-বারো গজ তফাতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের দুই পোর্টার দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হলো। একটা চোখ টিপল অফিসার, মুখ ঘুরিয়ে আবছাভাবে ইঙ্গিত করল অস্ট্রিয়ানের উদ্দেশে। অলস ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল দুই পোর্টার। তারপর পা বাড়াল লোকটার পিছন পিছন। ওদের একজন রানা এজেন্সির ব্রায়ান হারকোর্ট স্মিথ, অন্যজন বিএসএসের হ্যারি নিগেল।

কয়েক পা এগোতেই ডানে ল্যাভেটরি। চট্ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল স্মিথ। কেউ নেই ভেতরে। নিশ্চিত হয়ে পকেট থেকে ছোট, শক্তিশালী একটা কমিউনিকেটর বের করে খুব দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল সে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, বেরিয়ে এসে যোগ দিল স্মিথ হ্যারির সঙ্গে। ফ্রানজ ওসনিয়াক তখন কনকোর্সের শেষ মাথায় মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাচ্ছে। টেরও পেল না ওপরের ব্যালকনি থেকে টপাটপ্ চার পাঁচটা ছবি তুলে নেয়া হলো তার এই ফাঁকে।

আচমকা যেন ঢিল পড়েছে মৌচাকে। স্মিথের নির্দেশে এয়ারপোর্টে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও চারজন সহকারী যোগ দিল ওদের সঙ্গে। ফ্রানজ ওসনিয়াককে চারদিক থেকে ঘেরাও করে এগোতে থাকল দলটা। দু'নম্বর টার্মিন্যাল ভবনের সামনের র‍্যাঙ্ক থেকে ট্যাক্সি চাপল অস্ট্রিয়ান। তিনটে গাড়িতে ভাগ ভাগ হয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে লোকটাকে অনুসরণ করতে লাগল ওরা ছয়জন।

বেজওয়াটারের সাসেক্স গার্ডেন ও এজওয়্যার রোডের সংযোগস্থল প্যাডিংটনে ট্যাক্সি ত্যাগ করল ওসনিয়াক। বি অ্যাণ্ড বি, বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট বোর্ডিং হাউস আছে এখানে অনেকগুলো। এ বোর্ডিং ও বোর্ডিং ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল অস্ট্রিয়ানকে, তার মানে রিজার্ভেশন নেই লোকটার। অবশেষে একটার জানালায় 'রুম খালি' নোটিশ ঝুলতে দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

আশ্রয় জুটেছে ব্যাটার, ভাবল স্মিথ। পাশে বসা নিগেল হ্যারিকে বলল, 'তুমি ওটার ব্যাক ডোরের ওপর নজর রাখো। আমি কথা বলছি চীফের সাথে।' বিনা বাক্য ব্যয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। ঘড়ি দেখল স্মিথ। এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেছে ওরা এক ঘণ্টা আগে। আর দেরি না করে যোগাযোগ করল সে মাসুদ রানার সঙ্গে।

'একটার খোঁজ বোধহয় পাওয়া গেছে, চীফ।'

'হোয়াট!' লাফিয়ে উঠল রানা। 'কোথায়?'

'প্যাডিংটনের এক বোর্ডিং হাউসে ঢুকেছে এসে। আমরা আছি পাহারায়।'

'কোন্ দেশী?'

'অস্ট্রিয়ান। নাম ফ্রানজ ওসনিয়াক।'

'ওকে সন্দেহ করার কারণ?'

'পাসপোর্টে গোলমাল আছে। রেড লাইট শো করেছে কম্পিউটর।'

'ছবি তোলা হয়েছে?' উত্তেজনায় ফ্যাঁসফেঁসে শোনাচ্ছে রানার কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। এতক্ষণে মামির হাতে পৌঁছেও গেছে হয়তো।'

'অল রাইট। আমি যাচ্ছি মামির ওখানে। ক'জন আছ তোমরা?'

'ছয়জন।'

'গুড। আর, স্মিথ! ওয়েলডান। রাখছি। যোগাযোগ রেখো।'

'রাইট, চীফ।' কমিউনিকেটর রেখে বোর্ডিঙ হাউসের দিকে নজর দিল ব্রায়ান হারকোর্ট স্মিথ। সন্ধে হয়ে এসেছে। কোন ঘটনা ছাড়াই মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে। দশ মিনিট পর পর অন্যদের সঙ্গে কথা বলছে স্মিথ। তার নির্দেশে অন্য চারজন আরও আগেই বেরিয়ে পড়েছে গাড়ি ছেড়ে।

বোর্ডিঙ হাউসের সামনের রাস্তার ওপারে দু'জন আর এপারে দু'জন রয়েছে তারা। সবার সঙ্গেই রয়েছে একটি করে কমিউনিকেটর। আশায় আশায় রয়েছে, কিছু একটা করবে ফ্রানজ ওসনিয়াক। কিন্তু করছে না। কিছুই করছে না লোকটা। একসময় প্রতীক্ষার অবসান ঘটল ওদের। ঠিক সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এল অস্ট্রিয়ান। গা ছাড়া ভঙ্গিতে এজওয়্যার রোডের সাধারণ মানের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল। সাপার সারল ধীরেসুস্থে। ওখান থেকে বেরিয়ে আবার বোর্ডিঙ হাউস।

পথে কারও সঙ্গে কথা হয়নি ওসনিয়াকের। তুলে দেয়নি কিছু কারও হাতে, নেয়ওনি কিছু কারও কাছ থেকে। তবে দুটো কাজ করেছে সে যা তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত করে তুলেছে ওদেরকে। রেস্টুরেন্ট যাওয়ার পথে একটা দোকানের শো-কেসের কাঁচে চোখ রেখে পিছনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা কয়েক সেকেণ্ড। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছে বোর্ডিঙ হাউস পর্যন্ত। যখন নিশ্চিত বুঝেছে ওসনিয়াক যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, সোজা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকেছে। খাওয়ার সময় পাশের টেবিলে কফি পানরত ব্রায়ান স্মিথের দিকে একবার ভুলেও তাকায়নি লোকটা।

খাওয়া সেরে বেরিয়ে এসে আরেক খেল্ দেখিয়েছে লোকটা। রেস্টুরেন্ট আর বোর্ডিঙ হাউসের মাঝামাঝি পৌঁছে হাণ্ড্রেড মিটার স্প্রিন্ট দেয়ার মত আচমকা এক দৌড়ে রাস্তা অতিক্রম করে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে উঠেই কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেছে পিছনে, আর কেউ স্প্রিন্ট দেয়

কি না বোঝার জন্যে। কিন্তু তেমন কেউ ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। ওসনিয়াক যখন সম্ভাব্য অনুসরণকারীকে পিছনে খুঁজছে, তারা তখন ওপারেই, তার দশ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খোঁজার ভান করছে।

'শালারা আধুনিক কায়দা আর কবে শিখবে!' আপনমনে হেসেছে স্মিথ।

ওদিকে বিএসএস রেকর্ড অফিসে বসে ছটফট করছে মাসুদ রানা। আসার সময় গিলটি মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কাজে লাগতে পারে ভেবে। খবর পেয়ে স্যার লংফেলোও এসেছেন একটু আগে। এনসাইক্লোপেডিক মেমোরির অধিকারী পঁয়ষট্টি বছরের মিস ডরোথির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে ওরা। বৃদ্ধা সবার কমন মামি।

অন্য সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির তুলনায় বিএসএসের রেকর্ডরুমই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। এর সবচেয়ে বড় অংশটির নাম অ্যালবাম সেকশন। এমন কোন ব্যক্তি; যাকে বিদেশী এজেন্ট বা স্পাই হতে পারে বলে সন্দেহ হবে, পৃথিবীর সব গোয়েন্দা সংস্থাই ছবি তুলে রাখে তার সুযোগমত। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা হয় ছবিগুলো। সন্দেহ সত্য হোক, না হোক, প্রতি বছর অমন হাজার হাজার ছবি তুলে থাকে তারা। সব সময় সন্দেহভাজনদের ছবিই তোলা হয়, ব্যাপারটা তাও নয়। যার খুশি তারই ছবি তোলে ওরা।

এর কোনটিই ফেলে দেয়া হয় না। সযত্নে তুলে রাখা হয় অ্যালবাম সেকশনে। কে জানে কখন কোনটির প্রয়োজন দেখা দেবে। বিদেশী ডিপ্লোম্যাট, ট্রেড ডেলিগেটের সদস্য, সাইন্টিফিক অথবা কালচারাল ডেলিগেটের সদস্য, এদের ছবি তোলা হয় বেশি। কোন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা মহিলার সর্বোচ্চ ষাটটি পর্যন্ত ছবিও রয়েছে ব্রিটিশ অ্যালবাম সেকশনে। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে—সময়ে তোলা।

এছাড়া সংস্থাগুলোর আন্তঃদেশীয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিময় চুক্তির ফলেও এক সংস্থা অন্য সংস্থার কাছ থেকে প্রচুর ছবি পেয়ে থাকে প্রতি বছর। কখনও হয়তো কোন সোভিয়েত ট্রেড ডেলিগেশন গেল কানাডা সফরে। তাতে রয়েছে হয়তো ইভানভ। সন্দেহভাজন। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস অবিলম্বে তার ছবি পাঠিয়ে দেবে ওয়াশিংটন, লণ্ডন ও অন্যান্য ন্যাটো মিত্রদের কাছে। সযত্নে ছবিটা সংরক্ষণ করা হবে।

হয়তো পাঁচ বছর পর কোন এক এশিয়ান অথবা আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিক হিসেবে দেখা যাবে তাকেই। কিন্তু তখন তার নাম কজলভ। এসব ক্ষেত্রে ইভানভ বা কজলভ বা আর যা-ই হোক লোকটির নাম, তার ছবির নিচে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্যাপশন হয় 'ফুল টাইম কেজিবি হুড'। সোভিয়েত এবং তার মিত্রদের বেলায় বিএসএস অত্যন্ত হুঁশিয়ার। এদের রুশ বা ইস্ট ব্লক স্পাই অথবা সম্ভাব্য স্পাইয়ের ছবির আর্কাইভ দেখলে মাথা ঘুরে যাবে যে কারও। এভারেস্ট সমান তার অ্যালবামের পাহাড়।

এর অর্ধেক সংগ্রহও যাদের নেই, তারা পর্যন্ত যেখানে সদ্য তোলা কারও ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্যে তার অতীতে তোলা কোন ছবি আছে কি না খুঁজে বের করতে কম্পিউটরের শরণাপন্ন হয়, সেখানে বিএসএস শরণাপন্ন হয় মিস্ ডরোথির। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধার। অদ্ভুত তার স্মরণশক্তি।

নাকের আকার, চোয়ালের গঠন, থুতনির কাটা দাগ, গালের তিল কি আঁচিল, ঠোঁটের বাঁক, চোখের আকার, গ্লাস অথবা সিগারেট ধরার ভঙ্গি, বা অস্ট্রেলিয়ার কোন পাবে হাসতে গিয়ে বেরিয়ে পড়া বাঁধানো দাঁত, একবার দেখলেই মুখস্থ হয়ে যায় বৃদ্ধার। জীবনেও ভোলে না।

ফ্রানজ ওসনিয়াকের ছবিগুলো পাশাপাশি বিছিয়ে চেয়ে আছে মামি।

কপালের কোঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকে আছে। ভেতরে অস্থিরতা থাকলেও তা চেপে রেখেছে সামনে বসা তিনজন। ঝাড়া এক ঘণ্টা পর দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল বৃদ্ধা, 'ফার ইস্ট!' উঠে গিয়ে একটা র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল। মিনিট পাঁচেক খোঁজাখুঁজি করে বের করে আনল প্রয়োজনীয় অ্যালবাম।

ফ্রানজ ওসনিয়াকের একটা ছবি বের করল মামি ভেতর থেকে। পাঁচ বছর আগে তোলা। তখন তার চুল অনেক ঘন ছিল। কোমর ছিল সরু। টোকিওর ভারতীয় দূতাবাসের এক পার্টিতে হাসিমুখে আলাপ করছে আরেকজনের সঙ্গে।

'চেক,' ঘোষণা করল মিস ডরোথি। 'পাঁচ বছর আগে টোকিওর চেক দূতাবাসের লো-লেভেল এজেন্ট ছিল। নাম জিরি হেইক।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার। খুশিতে না কিসে ঠিক বোঝা গেল না।

পরদিন সকাল এগারোটায় আবার বোর্ডিং হাউস ত্যাগ করল ফ্রানজ ওসনিয়াক। তার ওপর নজর রাখার জন্যে গিলটি মিয়াসহ রানা এজেন্সির সাতজন ওয়াচার রয়েছে এ মুহূর্তে। রাতে লোকটার আসল পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিল মাসুদ রানা। কিন্তু বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ওসনিয়াককে আর বেরোতে দেখা গেল না, তখন ফিরে গিয়েছিল ও সকালে আসার কথা বলে। যদি না এর মাঝে আসার প্রয়োজন পড়ে।

স্মিথ-হ্যারি ও অন্যদের বদলে রাতের পাহারাদারীর জন্যে এসেছিল আরেক দল। সে সময়ও থেকে গিয়েছিল গিলটি মিয়া রানার নিষেধ অমান্য করে। রাতে বিশ্রাম নিয়ে সকালে আসার কথা বলেছিল ওকে রানা।

'কাজের সোমায় আবার কিসের বিশ্রাম?' উত্তর দিয়েছিল গিলটি

মিয়া। 'চিন্তায় আমার ঘুম হবে ভেবেচেন? মাজরাতে উটে যদি ব্যাটা ন্যাজ তুলে পালায়, তকন?'

গাড়িতে বসেই রাত কাটিয়েছে গিলটি মিয়া। চোখ ছিল বোর্ডিঙ হাউসের দরজায়, ব্যাটা ন্যাজ তুলে পালায় কি না দেখার জন্যে। সকালে রাতের দল বিদেয় নিয়েছে, এসেছে কালকের দল। কিন্তু তাকে নড়ানো যায়নি। অনেকদিন পর মনের মত একটা কাজ পেয়েছে সে। মিস্ করতে রাজি নয় কারও কথায়।

এজওয়্যার রোডে এসে ট্যাক্সি নিল অস্ট্রিয়ান। রওনা হলো পার্ক লেন। পিছনে ব্রায়ান স্মিথের নেতৃত্বে তিনটে গাড়িতে তাকে অনুসরণ করছে দলটা। পিকাডিলিতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ওসনিয়াক। তারপর পিছনের কাল্পনিক ফেউ খসাবার জন্যে কয়েকটা বেসিক ট্রিক্ খাটাল। ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়েছে গিলটি মিয়া ও অন্য তিনজন ওয়াচার। একটু পর হঠাৎ ঝেড়ে দৌড় দিল লোকটা কাছের বড়সড় এক অফিস বিল্ডিং লক্ষ্য করে।

এ মাথা দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এল রিয়ার এক্সিট দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল আর কেউ দৌড়ে আসছে কি না দেখার জন্যে। কিন্তু না, ছুটে আসছে না কেউ। দরকারও ছিল না। কারণ সংক্ষিপ্ত পথে আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে এক ওয়াচার। কাল রাতের কথা মনে রেখেছে ওরা। তাই লোকটাকে ট্যাক্সি বিদেয় করতে দেখেই সতর্ক হয়ে গেছে। দ্রুত ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছে।

চারদিক দেখে শুনে সন্তুষ্ট মনে লোয়ার রিজেন্ট স্ট্রীটের ব্রিটিশ রেল ট্রাভেল সেন্টারে এসে ঢুকল সে। কাউন্টারে শেফিল্ডের ট্রেন ক'টায় ক'টায় ছাড়ে জেনে নিল। তারপর রাত নয়টা পঁচিশের গাড়ির একটা রিটার্ন টিকেট কিনল। দ্বিতীয় শ্রেণীর। তার পাশের কাউন্টারে মাদারওয়েলের

টিকেট কেনার জন্যে খুচরো শিলিং গুণছিল এক যুবক, ওসনিয়াক কাউন্টার ত্যাগ করতেই তারও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। ক্লার্কের উদ্দেশে 'জাস্ট আ মিনিট' বলে পিছিয়ে এল সে।

খবরটা মাসুদ রানাকে জানানো হলো। 'লেগে থাকো ' নির্দেশ দিল ও। 'মিস্ লীড করার জন্যেও করে থাকতে পারে টিকেটটা।'

'আমার মনে হয় না, চীফ। অত বুদ্ধি নেই শালার। ওর টেক্নিক সব মান্ধাতা আমলের।'

'হতে পারে। তবে সন্দেহ নেই একেই খুঁজছি আমরা। ভিয়েনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ওরা কনফার্ম করেছে জিরি হেইক এসটিবির হলেও ভেতরে ভেতরে কেজিবির।'

'অল রাইট, চীফ। ভাবনার কিছু নেই। কথায় বলে চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন। ছুটতে পারবে না ও কিছুতেই।'

ওদিকে চার্লস স্ট্রীটের এক হোটেল কক্ষে জানালার পাশে বসে আছে মাসুদ রানা। বাঁ হাতে শক্তিশালী বিনকিউলার, ডান হাতে খুদে কমিউনিকেটর। ব্রায়ান স্মিথের সঙ্গে আলাপ সেরে বিনকিউলার চোখে লাগাল ও। কয়েকশো গজ দূরের সাউথ আফ্রিকান এমব্যাসি ওর লক্ষ্য। ডি অ্যাঙ্গাসের ওপর নজর রাখছে।

লোকটার সার্ভিস রেকর্ড জানা আছে মাসুদ রানার। দুই দফায় ভিয়েনার সাউথ আফ্রিকান এমব্যাসিতে সাত বছর চাকরি করেছে। ফ্রানজ ওসনিয়াক ওরফে জিরি হেইকের আগমনে তার মধ্যে বাড়তি কোন তৎপরতা দেখা যায় কি না আবিষ্কার করার আশায় বসে আছে রানা। কিন্তু দিনভর বসে থাকাই সার হলো। তেমন কিছু ঘটল না। যদিও তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। বলা যায় না, হয়তো শেফিল্ডেই মোলাকাত হবে দু'জনের।

রাত সাড়ে আটটায় শেষবারের মত বোর্ডিং হাউস ত্যাগ করল ফ্রানজ

ওসনিয়াক। ট্যাক্সি চেপে রওনা হলো গন্তব্যে। দশ মিনিট চলার পর লোকটার গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হলো ব্রায়ান স্মিথ, জানিয়ে দিল খবরটা মাসুদ রানাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পথে ছুটল ও লোয়ার রিজেন্ট স্ট্রীটের দিকে।

স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি বিদেয় করল অস্ট্রিয়ান। বেশ ধীরস্থির সে এবার। কোনদিক দেখাদেখি নেই, কোন ট্রিক খাটাবার চেষ্টাও নেই। নিশ্চিন্ত। ডিপারচার বোর্ডে চোখ বোলাচ্ছে। তার চারপাশে ভিড়ের মধ্যে মিশে রয়েছে মাসুদ রানা ও অন্যরা। নয়টা পঁচিশের লেস্টার-ডার্বি-চেস্টারফিল্ড-শেফিল্ড ইন্টারসিটি দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। একটু পর সেদিকে এগোল ওসনিয়াক।

প্রথমে বাইরে থেকে গাড়ির এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত ঘুরে এল লোকটা। এঞ্জিনের সঙ্গেই রয়েছে তিনটে ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিজ, বুফে কার। এরপর নীল কভার মোড়া ক্লাব সীটের তিনটে সেকেণ্ড ক্লাস ক্যারিজ। ওর মাঝেরটায় উঠে পড়ল অস্ট্রিয়ান। মাথার ওপরের র‍্যাকে গ্রিপটা রাখল। আরাম করে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

যাত্রী একেবারেই অল্প। কাজেই কাছাকাছি যাওয়ার ঝুঁকি নিল না রানা। ওসনিয়াকের সামনে-পিছনের ক্যারিজে ভাগ ভাগ হয়ে বসল। গিলটি মিয়া ও অন্য দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে রানা থাকল পিছনে। স্মিথসহ অন্যরা সামনে। ইন্টার ক্যারিজ কাঁচের দরজা দিয়ে ওসনিয়াককে দেখতে পাচ্ছে সবাই। গাড়ি ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে এক নিগ্রো যুবক উঠল মাঝেরটিতে। কানে ওয়াকম্যান। আধবোজা চোখ।

মিউজিকের তালে তালে তুড়ি বাজাতে বাজাতে ওসনিয়াকের তিন সারি সামনে বসে পড়ল সে। তারপর চোখ পুরো বুজে ফেলল। তুড়ি বাজাচ্ছে। পুরু সোলের কেডস্ পরা পা দোলাচ্ছে। তবে এতে রানা বা স্মিথের কোন অসুবিধে হলো না। দু'জনের ওপরই সমান নজর রাখতে

পারছে ওরা।

ঠিক সময় মতই সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশন ত্যাগ করল আন্তঃনগর। সোজা ছুটল উত্তরে। ঝাড়া এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট নিজের আসনে বসে থাকল অস্ট্রিয়ান। করার মত ছিলও না কিছু। সঙ্গে পত্রিকা-বই কিছুই আনেনি ব্যাটা। ধূমপানের অভ্যেসও নেই বোঝা গেল। জানালা দিয়ে স্রেফ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাল।

দশটা পঁয়তাল্লিশে গতি কমে এল আন্তঃনগরের। সামনেই লেস্টার। উঠে গ্রিপটা পাড়ল ওসনিয়াক। গ্রাহ্য করল না মাসুদ রানা ও তার সঙ্গীদের ভ্রূকুটি। টয়লেট এরিয়া পার হয়ে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। কাঁচ নামিয়ে পেট পর্যন্ত বাইরে বের করে দিয়ে ডানে তাকিয়ে থাকল ফ্রেমে দুই কনুইয়ে দেহের ভর চাপিয়ে।

গাড়ি থেমে দাঁড়াতে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো স্থানীয় রেলওয়ের এক পোর্টারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল অস্ট্রিয়ান। 'এক্সকিউজ মি, ইজ দিস শেফিল্ড?'

'নো, স্যার। ইট ইজ লেস্টার।'

'আহ্, সো। থ্যাঙ্ক ইউ।' গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর কাঁচ তুলে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এল। এগারোটা বারো মিনিটে দ্বিতীয়বারের ট্রেনের গতি কমে আসতে দেখে আবারও একই কাজ করল লোকটা। ডার্বি ইন করেছে গাড়ি। উঠে দরজায় এসে দাঁড়াল সে। একই প্রশ্ন করল একজন যাত্রীকে।

'ডার্বি,' উত্তর দিল যাত্রী।

গাড়ি যাত্রা শুরু করতে ফিরে এল আসনে। গ্রিপ্টা র‍্যাকে তুলে রেখে বসে পড়ল। এগারোটা তেতাল্লিশে চেস্টারফিল্ড স্টেশনে ইন করল গাড়ি। ভিক্টোরিয়ান মডেলের বিশাল, ঝকঝকে ভবন। মাথার ওপর রূপালি চেইনের সাহায্যে ঝোলানো অসংখ্য ফুলের ঝুড়ি।

উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল ফ্রানজ ওসনিয়াক। এবার আর গ্রিপ্টা

নিল না, র‍্যাকেই পড়ে থাকল ওটা। মুখ বের করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ডান পায়ে তাল ঠুকছে ফ্লোরে। চার-পাঁচজন যাত্রী নামল এখানে। গাড়ি ছাড়ার আগেই ফাঁকা হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম। লম্বা হুইসল বাজাল এঞ্জিন, পরমুহূর্তে বিশাল এক পাইথনের মত হেলেদুলে রওনা হলো ইন্টার সিটি।

হঠাৎ ঝট করে সিধে হলো অস্ট্রিয়ান, কেউ কিছু ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই এক হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল। প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়ল। ছুটে এল সবাই। এমনটা কেউ-ই আশা করেনি। গতি এখনও তেমন তুলতে পারেনি গাড়ি, ইচ্ছে করলেই নেমে যেতে পারে সবাই। কিন্তু তাতে ফাঁস হয়ে যাবে ওদের উপস্থিতি। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে নিজেদের গোপন রাখা যাবে না।

চট্ করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল মাসুদ রানা। শিকার হাতছাড়া হওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা। এদিকেই তাকিয়ে ছিল ওসনিয়াক, যখন নিশ্চিত হলো আর কেউ নামেনি গাড়ি থেকে, নিশ্চিন্তমনে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার দেহে। ঝট্‌কা মেরে দরজা খুলে ফেলল ও।

'শেফিল্ড চলে যাও তোমরা,' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে যত তাড়াতাড়ি পারো। দরজা বন্ধ করে দাও।'

রানিং বোর্ডে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। বাইরে অন্ধকার। বেশ বেড়ে গেছে ট্রেনের গতি। ত্রিশ মাইলে উঠে গেছে কম করেও। মনে খানিকটা দ্বিধা থাকলেও সাহস হারাল না ও। ঝাঁপ দিল সামনে প্যারাট্রুপারদের মত। মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করল যেন কোন লোহার খুঁটি বা বোল্ডারের ওপর আছড়ে না পড়ে। বাতাসের গতি অনুযায়ী প্যারাট্রুপাররা এগারো থেকে পনেরো মাইল গতিতে মাটি স্পর্শ করে।

মাসুদ রানা করল বিশ মাইল গতিতে। তবে ওর ভাগ্য ভাল, কার্পেটের

মত মোলায়েম, ঘন মে-ঘাস মৃদু অভ্যর্থনা জানাল। পরমুহূর্তেই বল হয়ে গেল রানা। পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত দু'হাঁটু বুকের কাছে, কনুই দুই পায়ের ফাঁকে, মাথা ও দুই হাঁটু দুই কনুইয়ের মাঝখানে—টেনিস বলের মত ড্রপ্ খেতে খেতে পনেরো-বিশ গজ গিয়ে থামল মাসুদ রানা। আন্তঃনগর ততক্ষণে সরে গেছে অনেক দূরে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ও। ছুটল আলোকিত স্টেশনের দিকে। টিকেট ব্যারিয়ারের সামনে যখন পৌঁছল রানা, গার্ড তখন রাতের মত কাজ সেরে স্টেশন সংলগ্ন নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়িয়েছে। ওর দিকে তাকাল লোকটা অবাক হয়ে।

'শেষ যে যাত্রীটি বেরিয়ে গেল, গ্রে স্যুট পরা, খালি হাত, কোনদিকে গেছে লোকটা?'

হাত তুলে স্টেশনের সামনের কার পার্ক দেখাল গার্ড, 'ওদিকে।'

তীরবেগে ছুটল মাসুদ রানা। পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকছে ওকে গার্ড, 'হেই, ম্যান! হেই, কাম ব্যাক!' টিকেটের কথা মনে পড়ে গেছে বোধহয় তার। পাত্তা দিল না রানা কার পার্কে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাল। একটা ট্যাক্সিও নেই। শেষ গাড়িটাই নিয়ে ভেগেছে হারামজাদা। হঠাৎ ওপাশের আড়াল থেকে এক পোর্টারকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। সঙ্গে মোটর সাইকেল রয়েছে লোকটার, ঠেলে নিয়ে আসছে। বাড়ি ফেরার ধান্ধায় আছে হয়তো।

সেদিকে ছুটল রানা। দৌড়ের ফাঁকে পকেট থেকে একশো পাউণ্ডের দুটো নোট বের করে ফেলেছে। ও দুটো পোর্টারের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'দু'ঘণ্টার জন্যে তোমার বাইকটা ধার দাও।'

'হবে না,' সোজা সাপ্টা জবাব লোকটার। চেহারা দেখে চোর-ছ্যাঁচড় ভেবেছে হয়তো রানাকে।

ওজন মেপে মারল রানা। কথা বাড়াবার সময় নেই, অনেক দূরে চলে গেছে তখন ফ্রানজ ওসনিয়াক। তার চোয়ালের ওপর মাঝারি শক্তির এক

ঘুসি বসিয়ে দিল মাসুদ রানা। জায়গাটা চেপে ধরে বসে পড়ল পোর্টার বাইক ছেড়ে। এক লাফে এগিয়ে এসে পড়ন্ত বাইক ধরল রানা, নোট দুটো লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কিক্ করল স্টার্টারে। 'সরি,' দুঃখ প্রকাশ করল ও। 'সকালে ফেরত পাবে গাড়ি।'

পরমুহূর্তেই লাফিয়ে ছুটল মোটর সাইকেল। রাস্তার দু'পাশের সবগুলো পোস্টেই আলো আছে, কাজেই হেড লাইট জ্বালল না রানা। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একজোড়া টেইল লাইট, গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে ধেয়ে চলল সেদিকে। পর পর দু'তিনটে ট্রাফিক পয়েন্টে লাল সিগন্যালের কারণে দাঁড়াতে হলো ট্যাক্সিটিকে, ফলে ব্যবধান দ্রুত কমিয়ে আনতে সক্ষম হলো রানা। হলিওয়েল রোড ছেড়ে ওটা যখন সল্টারগেটে পৌঁছল, ও তখন ওসনিয়াকের মাত্র একশো গজ পিছনে।

হঠাৎ ট্যাক্সির ব্রেক লাইট জ্বলে উঠতে দেখল মাসুদ রানা। জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল ও বাইক। বন্ধ করে দিল এঞ্জিন। ওসনিয়াক বেরিয়ে পড়েছে গাড়ি ছেড়ে, তাকাচ্ছে না সে কোনদিকে। কেউ যে ওকে অনুসরণ করেনি সে ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। মোটর সাইকেলটা পথের পাশে কাৎ করে শুইয়ে রাখল মাসুদ রানা। নিজেও বসে পড়ল ওটার পাশে।

চলে গেল ট্যাক্সি। জন-যানহীন পথের এ-মাথা ও-মাথা নজর বোলাল একবার অস্ট্রিয়ান, তারপর রাস্তা পেরিয়ে ওপারের উঁচু দেয়াল ঘেরা চেস্টারফিল্ড ফুটবল মাঠের দিকে চলল। ছায়ায় ছায়ায় সন্তর্পণে এগোল মাসুদ রানা। মাঠ অর্ধেকটা চক্কর দিতেই কম্পটন স্ট্রীট। মাঠের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো এ রোডের বাড়িগুলো। বেশিরভাগই অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষ। সোজা হেঁটে গিয়ে ওর একটার সামনে থামল ওসনিয়াক। নক্ করল দরজায়।

কয়েক সেকেণ্ড পর আলো জ্বলে উঠল অন্ধকার ঘরটির ভেতরে। দরজা খুলে গেল, ভেতরে সেঁধিয়ে গেল ফ্রানজ ওসনিয়াক। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রানা, বসে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে। ঘড়ি দেখল, সবে

বারোটা পাঁচ। আশ্চর্য হলো ও, মাত্র বিশ মিনিট হয়েছে চেস্টারফিল্ড পৌঁছেছে ট্রেন? অথচ মনে হচ্ছিল-না জানি কয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ধারেকাছেই কোথাও গাড়ির আওয়াজ উঠল। মনে হলো দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা। খুব সম্ভব ফুটবল মাঠের ওপাশে কোথাও হবে। রানা যেখানে মোটর সাইকেল রেখে এসেছে, সেখানে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই আবার চলতে শুরু করল ওটা। আওয়াজ ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

পরক্ষণেই চমকে উঠল রানা কমিউনিকেটরে গিলটি মিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠ শুনে। 'স্যার, আপনি কি ধারেকাচে কোতাউ রয়েচেন।'

ব্যাপারটা বিশ্বাসই হতে চাইল না ওর। 'গিলটি মিয়া!'

'আপনি কোতায়, স্যার?'

'তুমি কোথায়!'

'মটোর সাইকেলটার কাচে।'

'কোন দিক থেকে এখানে আসতে হবে জানাল তাকে রানা। দুই মিনিট পর ভূতের মত নিঃশব্দে হাজির হলো মানুষটা। নির্দেশ অমান্য করেছে গিলটি মিয়া, কাজেই ওর ওপর রাগ হওয়ার কথা। অথচ উল্টে কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা।

'কি করে এলে তুমি?'

একটু ইতস্তত করল গিলটি মিয়া। 'আপনার পেচন পেচন আমিও লাপিয়ে পড়েচিলুম টেরেন থেকে।'

'ওরা বাধা দেয়নি তোমাকে?'

অন্ধকারে সাদা দাঁত দেখা গেল তার। 'সুযোগ পেলে তো!'

'খুব খারাপ কাজ করেছ। হাত-পা ভাঙত যদি?'

'আপনার হাত-পা ভাঙত যদি?'

এরপর কথা বাড়ানো নিরর্থক। 'বুঝলাম। কিন্তু এতদূর এলে কি করে?'

'গাড়িতে করে।'

'কোথায় পেলে গাড়ি!'

'আপনি স্যার দেকেননি। ইস্টিশানের বাইরে বাঁ দিকে একটা পেট্রল পাম্প ছিল। আপনি তো কুলি ব্যাটাকে ঢিসুম দিয়ে লম্বা দিলেন। আমি কি করি? খুঁজতে খুঁজতে গেলাম পেট্রল...'

'কথা কম। সংক্ষেপে বলো।'

মুখ ব্যাজার হয়ে গেল গিলটি মিয়ার। ভেবেছিল গাড়ি সংগ্রহের কাহিনী শেষ করে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার লোমহর্ষক একটা বর্ণনা দেবে। কিন্তু হলো না। 'ওকেনে তেল নিচ্চিল একটা ট্যাক্সি। ওটা লিয়ে এয়েচি।'

'ভাল করেছ।' রানা জানে আরও কথা বাকি আছে গিলটি মিয়ার। চান্স পেলে রাত কাবার করে দিতে পারবে। কাজেই চুপ করিয়ে দিল ওকে। 'বসে পড়ো চুপ করে।'

দুটোর দিকে ব্রায়ান স্মিথের সাড়া পাওয়া গেল। রেঞ্জের ভেতর এসে পড়েছে ওরা। আরও আধঘণ্টা পর একত্র হলো সবাই। রানার সঙ্গে গিলটি মিয়াকে দেখে আশ্চর্য হলো দলের অন্যরা। 'গড!' অস্ফুটে বলল ব্রায়ান। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম... ।'

আরেকবার দন্ত প্রদর্শন করল গিলটি মিয়া।

বিটওয়েল স্ট্রীট। চেস্টারফিল্ড পুলিস স্টেশনে পুলিস সুপার স্যাম রসটনের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। এত রাতে গভীর ঘুম থেকে উঠে আসতে হয়েছে বলে মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন ভদ্রলোক। তবে মাসুদ রানা কেন কি কাজে এসেছে, খানিকটা আভাস পাওয়ার পর মেজাজ মোটামুটি নিউট্রাল হয়েছে।

সুপারের আগ্রহ মেটাবার জন্যে আসল ঘটনা যতদূর সম্ভব রেখে-ঢেকে জানাল মাসুদ রানা। 'বলেন কি!' লাফিয়ে উঠলেন সুপার। 'তাহলে তো এখনই অ্যারেস্ট করতে হয় ব্যাটাকে।'

'উঁহুঁ, তাতে কোন লাভ হবে না। অ্যারেস্ট করলে তো লণ্ডনেই করা যেত।'

'তাহলে?'

'আগে জানতে হবে ওই বাড়িতে কে থাকে।'

'কোন সমস্যা নয়। নম্বর কত বাড়িটার?'

'অন্ধকারে দেখতে পাইনি। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সে জন্যে।'

'আই সী দ্য পয়েন্ট। তাহলে আর কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'সকালে চার-পাঁচজন ওয়াচার দরকার হবে আমার। আমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের কাউকে না কাউকে ট্রেনে হয়তো দেখেছে লোকটা। এখানে যদি আবার দেখে নিশ্চয়ই সন্দেহ করে বসবে।'

'দেয়া যাবে। আর কিছু?'

'যে বাড়িতে ঢুকেছে আমার সাসপেক্ট, তার মুখোমুখি কোন একটা বাড়ি প্রয়োজনে খালি করে দিতে হবে। অথবা যদি রাস্তার দিকের একটা রুমও পাওয়া যায়, তাতেও চলবে। আড়াল থেকে লোকটার এবং ও বাড়িতে আর যারা থাকে তাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে দরকার হবে। আমার লোক থাকবে ওখানে।'

কি যেন ভাবলেন সুপার। কম্পটন রোড বললেন না? আমার এক বন্ধু থাকে ওখানে, আটষট্টি নম্বর বাড়ি ও...'

রানার কমিউনিকেটর খড়মড় করে উঠতে থেমে পড়লেন ভদ্রলোক। ওটা মুখের কাছে তুলল রানা। 'ইয়েস! হ্যাঁ, কত? ফিফটি নাইন? শিওর? ঠিক আছে।' যন্ত্রটা টেবিলে রাখল রানা। 'আমার লোক বলছে ওই বাড়ির নম্বর উনষাট।'

'দারুণ!' বললেন সুপার। 'মনে পড়েছে, আমার বন্ধুর মুখোমুখি বাড়িটির নম্বর ষাট।'

নয়

ভোর চারটা। কম্পটন রোডের আটষট্টি নম্বর বাড়ির কিচেনে দাঁড়িয়ে আছেন পুলিস সুপার স্যাম রসটন। পিছন দরজা দিয়ে ঢুকেছেন ভদ্রলোক।

'কি বললে?' চোখ বড় করে সুপারের দিকে চেয়ে আছেন বাড়ির মালিক ব্যারি ব্যাংকস্। 'ডাকাত?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন রসটন।

'মাই গড!' পাশে দাঁড়ানো হতভম্ব স্ত্রীর দিকে তাকালেন একবার ভদ্রলোক। 'তা এখন কি করতে চাইছ?'

'খানিক কষ্ট দেব তোমাদের। ওপরতলার রাস্তার দিকের একটা রুম ছেড়ে দাও। আমার লোক ওখান থেকে নজর রাখবে বাড়িটার ওপর।'

'তা না হয় দিলাম,' চিন্তিত ব্যাংকস্। 'কিন্তু এখনই কেন অ্যারেস্ট করছ না ওদের?'

'ধারণা করছি দলে আরও লোক আছে ওদের। টাকার বখ্রা নিতে আসতে পারে। তখন একসঙ্গে ধরতে চাই সব ক'টাকে।'

'তাহলে দেরি করে কাজ নেই। যাও, ডেকে নিয়ে এসো সবাইকে। রুম একটা খালিই আছে ওপরে।'

ওদিকে পুলিস স্টেশনে এক ডেস্ক সার্জেন্টের সামনে বসে আছে মাসুদ রানা। ইচ্ছে করেই সুপারের সঙ্গে যায়নি ও। উনষাট কম্পটন স্ট্রীটে কে বা কারা থাকে, জানার জন্যে রয়ে গেছে। রেকর্ড রুম থেকে একটা ফাইল

নিয়ে এসে ভেতরে নজর বোলাচ্ছে সার্জেন্ট।

'দু'জন থাকে ও বাড়িতে। ওরা গ্রীক সাইপ্রিয়ট, স্যার,' বলল সার্জেন্ট। 'দুই ভাই, যমজ। দুজনেই অবিবাহিত। অ্যানড্রিয়াস এবং স্পিরিডন স্টেফানিডেস। চার বছর ধরে আছে এখানে। হলিওয়েল ক্রসে ডোনার কাবাবের ব্যবসা আছে।'

স্লীপার ট্র্যান্সমিটার, ভাবতে লাগল মাসুদ রানা, এবং লো-লেভেল দুই স্লীপার—ডীপ কভার এজেন্ট! ওই ঘরেই কি আছে সেই ট্র্যান্সমিটারটি, যেখান থেকে স্কোয়ার্ট দুটো ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে? ডার্বিশায়ার পিক ডিস্ট্রিক্ট এবং শেফিল্ডের উত্তরের পাহাড়ি এলাকা, দুটোই খুব কাছাকাছি এখান থেকে। ট্র্যান্সমীটিং সেরে চট্ করে এখানে এসে গা ঢাকা দেয়া খুব সম্ভব। বোমার অংশগুলোও কি এখানে এনে জড়ো করা হয়েছে? উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল মাসুদ রানা।

টেলিফোন তুলল ও। ঘুম ভাঙাল স্যার লংফেলোর। 'কি ব্যাপার, রানা? খবর ভাল?'

'মোটামুটি, স্যার। জরুরী একটা প্রয়োজনে ডিসটার্ব করছি আপনাকে।'

'দ্যাট'স অল রাইট, সান। বলো।'

'যাকে ফলো করছি, সে হয়তো আজ কোনও এক সময় ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করবে। যদি করে, আমি চাই কেউ যেন বাধা না দেয় তাকে। আমার সন্দেহ তাকে ভিয়েনায় আশা করবে কেউ নির্ধারিত সময়ে। ও পৌঁছতে ব্যর্থ হলে অন্যরকম হয়ে যেতে পারে পরিস্থিতি।'

'বুঝেছি। সকালে তোমার হয়ে অর্ডারটা ইস্যু করে দেব আমি।'

'ওর পাসপোর্ট নাম্বার হিথ্রোর সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানতে পারবেন আপনি।'

'ওকে।'

একটু পর ফিরে এলেন পুলিস সুপার রসটন। একান্তে আধ ঘণ্টা আলাপ করল রানা তাঁর সঙ্গে।

সকাল সাড়ে ন'টায় ফিফটি নাইন, কম্পটন রোড ত্যাগ করল ফ্রানজ ওসনিয়াক। হ্যারি নিগেল এবং আরেকজন অ্যাশগেট রোড থেকে পিছু নিল তার। ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে গেল লোকটা, উঠে পড়ল লণ্ডনগামী ট্রেনে। সেন্ট প্যানক্রাসে অন্য একদল ওয়াচারের ওপর লোকটার ভার ছেড়ে দিয়ে চেস্টারফিল্ডে ফিরে এল প্রথম দু'জন।

বোর্ডিং হাউসে আর গেল না ফ্রানজ ওসনিয়াক। যদি কিছু রেখে এসে থাকে সে ওখানে, এক সেট পায়জামা-শার্টসহ হ্যাণ্ড গ্রিপ ট্রেনে ফেলে যাওয়ার মতই একেবারে ফেলে এসেছে। সোজা হিথ্রো এল সে। দুটোর ফ্লাইটে রওনা হয়ে গেল ভিয়েনা। সোভিয়েত এমব্যাসির দু'জন রিসিভ করল তাকে ওখানে।

ঠিক এগারোটায় বাসা থেকে বেরোল দুই গ্রীক সাইপ্রিয়ট। এরাও প্রায় মধ্যবয়সী। পুলিস সুপারের সরবরাহ করা শক্তিশালী লেন্সওয়ালা ক্যামেরার সাহায্যে বেশ কিছু ছবি তোলা হলো ওদের। ছবি নিয়ে ব্রায়ান স্মিথ রওনা হয়ে গেল লণ্ডন। ম্যানচেস্টার থেকে একদল এক্সপার্ট এসে গ্রীকদের বাসা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করল। একটা ডিরেকশন ফাইণ্ডার ব্লীপারও জুড়ে দেয়া হলো ওদের গাড়িতে।

শেষ বিকেলে উত্তর এল লণ্ডনের। জানা গেল, ওরা সাইপ্রিয়ট, কথাটা ঠিক নয়। এক সময় গ্রীক মেইনল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিল। গোঁড়া কমিউনিস্ট। হেলাস মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত ছিল দুই ভাই। প্রায় বিশ বছর আগে সাইপ্রাসের উদ্দেশে গ্রীস ত্যাগ করে ওরা পুলিসের তাড়া খেয়ে। লণ্ডনের প্রশ্নের উত্তরে এথেন্স জানিয়েছে, ওদের আসল নাম

কোস্টাপোপোলাস। নিকোশিয়ার মতে আট বছর আগে ওখান থেকে উধাও হয়ে গেছে দু'জনে।

এদিকে ক্রয়ডন ইমিগ্রেশন রেকর্ড অনুযায়ী সাইপ্রিয়ট নাগরিক পরিচয়ে লণ্ডন আসে ওরা দুই ভাই। ব্রিটেন সরকার তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এদেশে থাকার অনুমতি দেন স্টেফানিডেস ভ্রাতৃদ্বয়কে। সবশেষে চেস্টারফিল্ড রেকর্ড। এদের মতে সাড়ে তিন বছর আগে লণ্ডন থেকে এখানে আসে তারা। বাসা ভাড়া নেয় ফিফটি নাইন কম্পটন রোডে। হলিওয়েল ক্রসে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে কাবাব-ব্যবসা আরম্ভ করে। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির অমায়িক মানুষ দুই ভাই। আইন মেনে চলে কঠোরভাবে।

'হুঁম!' রিপোর্টগুলো রেখে দিল মাসুদ রানা। বাইরে ঘনিয়ে এসেছে রাত।

একটি ছাড়া আজকাল আর কোন ইউরোপিয়ান গাড়ি নির্মাতা অতীতের মত বড়, গোল হেড লাইট তৈরি করে না। এখন বেশিরভাগই চৌকো হয়ে গেছে। একমাত্র অস্টিন এখনও তৈরি করে। অস্টিন মিনির জন্যে কেবল। মাসুদ রানা যখন গ্রীক যমজদের ব্যাপারে লণ্ডনের রিপোর্ট পড়ছে, ঠিক সেই সময় সাউদাম্পটনের চেরবার্গ জেটিতে এই ধরনের একটি মিনি অস্টিন অবতরণ করল ফেরি থেকে। ওটা এসেছে অস্ট্রিয়ার সালজবার্গ থেকে।

অস্টিন এবং তার চালক-কাম-মালিক, কারও কাগজপত্রে কোন খুঁত নেই। অকৃত্রিম অস্ট্রিয়ান কাগজপত্র। আসলে লোকটি চেক এসটিবির এজেন্ট, ফ্রানজ ওসনিয়াকের মত।গাড়িটা সার্চ করল কাস্টমস। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। ছেড়ে দিল তারা ওটা। লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে গেল মিনি অস্টিন। এক নাগাড়ে দুই ঘণ্টা চলার পর সাউদাম্পটনের উত্তর প্রান্তে পৌঁছল গাড়িটা।

হেড লাইট নিভিয়ে পথের পাশের প্রকাণ্ড এক ঝোপের আড়ালে এসে গাড়ি দাঁড় করাল চালক। হাইওয়ে থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে চলে এসেছে সে। কেউ দেখতে পাবে না। একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে নেমে এল লোকটা, অন্ধকারেই শুরু করে দিল কাজ। প্রথমে বডি এবং হেডলাইট ইউনিটের মাঝের ফাঁক আড়াল করে রাখা চকচকে ক্রোম রিঙটা খুলে ফেলল সে।

এবার বডির ভেতরের উইঙের সঙ্গে জোড়া পুরো হেডলাইট ইউনিট খুলে বের করে আনল সকেট থেকে। ওর পিছনে, এঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে যুক্ত হওয়া তারগুলোও খুলে ফেলল সে। এরপর বালবের পিছনের অর্ধ গোলক আকৃতির রিফ্লেকটিং বাউল দুটো আলাদা করে একটা হেসিয়ান ব্যাগে পুরল লোকটা। অস্বাভাবিক ওজন ও দুটোর।

এক ঘণ্টারও বেশি ব্যয় হলো কাজটা সারতে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল চেক। চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত নিয়ে অন্ধের মত চেয়ে আছে মিনি অস্টিন। কাল কোন এক সময়, ভাবল লোকটা, ওরকম আরেক সেট হেডল্যাম্প কিনে আনবে সে সাউদাম্পটন থেকে। ওগুলো ফিট করে কাল রাতেই ফিরে যাবে সালজবার্গ।

সে তো পরের কথা, আগের কাজ আগে। সিগারেটটা মাড়িয়ে দিল চেক। ব্যাগ ঝোলাতে ঝোলাতে বড় রাস্তায় উঠে হেঁটে এগোতে লাগল ফেলে আসা বন্দরনগরীর দিকে। পাঁচশো গজমত এগোতে বাস স্টপটা আবার দেখতে পেল লোকটা। এটার সামনে দিয়েই গেছে সে তখন। ঘড়ি দেখল। বেশ সময় আছে হাতে এখনও। প্রায় পনেরো মিনিট।

আর কোন যাত্রী নেই বাস স্টপে। সে একাই। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল লোকটা। আরও পাঁচ মিনিট বাকি সময় হতে। হঠাৎ মোটর সাইকেলের ভারি আওয়াজে ঘাড় ফেরাল লোকটা। আগাগোড়া কালো পোশাক পরে রয়েছে বাইক চালক। থেমে দাঁড়িয়েছে বাইকটা তার

চার হাতের মধ্যে।

'রাতের শেষ বাসে বাড়ি ফেরা খুব বিরক্তিকর,' বলে উঠল লোকটা।

ফোঁস করে দম ছাড়ল চেক। 'তাও ভাল, যত দেরিই হোক, অন্তত পৌঁছানো যায়।'

ব্যাগটা আগন্তুকের হাতে তুলে দিল চেক। পিছনের ফাইবার গ্লাস বক্সে সঙ্গে সঙ্গে চালান হয়ে গেল তা। এই সময় স্টপেজে এসে থামল সাউদাম্পটনের শেষ বাস। উঠে পড়ল লোকটা। ছেড়ে দিল বাস। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকল তাতায়েভ। তারপর বিএমডব্লিউ ঘুরিয়ে রওনা হলো লণ্ডনের দিকে।

পরদিন সূর্যোদয়ের একটু আগে ইপসউইচ পৌঁছল সে থেটফোর্ড হয়ে। মনটা দারুণ খুশি। নবম চালান পৌঁছে গেছে হাতে। সর্বশেষ চালান।

পরদিন সকালে ইপসউইচ শহরের এ-দোকান ও-দোকানে কেনাকাটা করতে দেখা গেল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভকে। হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে প্রথমেই কিনল সে একটা হালকা, খাটো হাতলওয়ালা দুই চাকার পুশ ট্রলি। সাধারণত ভারি কোন বোঝা, বস্তা, ডাস্টবিন বা স্যুটকেস স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয় এগুলো। নির্মাণ সামগ্রী বিক্রি করে এমন একটি দোকান থেকে কিনল দুটো দশ ফুটি তক্তা।

এরপর অফিস ইকুইপমেন্টের বড় এক দোকানে দেখা গেল তাতায়েভকে। এখান থেকে ছোট একটা স্টীলের ফাইলিং কেবিনেট কিনল সে। ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, আঠারো ইঞ্চি পাশে, বারো ইঞ্চি গভীর। একটা টিম্বার স্টোর থেকে সংগ্রহ করল কয়েকটি কাঠের হুড়কো, গোল ব্যাটন এবং কড়িকাঠ জাতীয় এক খণ্ড কাঠ। ওখান থেকে বেরিয়ে একটা ডু-ইট-ইওর-সেলফ দোকানে ঢুকল তাতায়েভ। কিনল কমপ্লিট এক সেট টুল

বক্স। নানান মাপের বিটসহ একটি হাই-স্পীড ড্রিল মেশিন। পেরেক, নাট-বল্টু, স্ক্রু এবং এক জোড়া হেভি ডিউটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্লাভস্।

এখানকার কাজ সেরে এক প্যাকেজিঙ ওয়্যারহাউসে ঢুকল মেজর ভ্যালেরি। কিনল কিছু ফোম ইনসুলেশন। সবশেষে ইলেক্ট্রিক এমপোরিয়াম থেকে চারটা নয় ভোল্টের ব্যাটারি এবং কয়েক গজ মাল্টিকালারড সিঙ্গল-ফ্লেক্স তার কিনল সে।

এত জিনিস সেলুনে করে চেরিহে'জ ক্লোজে নিয়ে আসতে দুটো ট্রিপ দিতে হলো ভ্যালেরিকে। সমস্ত কিছু গ্যারেজেই ফেলে রাখল সে। আবার রাত নামতেই ওর বেশিরভাগ স্থান পেল কিচেনে।

সে রাতেই তাতায়েভের জন্যে নির্ধারিত মস্কো রেডিওর কমার্শিয়াল ব্যাণ্ড জানাল তার 'অ্যাসেম্বলার' আসার সংবাদ। দু'দিন পর লণ্ডন পৌঁছবে সে।

রুমটা বেশ বড়। রাস্তার দিকে তিনটে জানালা। মাঝেরটার সামনে বসে আছে মাসুদ রানা। আরও একটা রাত কেটে গেছে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছাড়াই। কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখা যায়নি গ্রীক যমজের। আজও ঠিক সময়ই কাজে বেরিয়েছে তারা। ফিরেও এসেছে যথানিয়মে। বেতাল কিছু করার চেষ্টাও করেনি। এমন কি বাসা বা দোকানের টেলিফোনও তোলেনি ওরা নিজে থেকে। যে ক'টা ফোন এসেছে, দোকানের নাম্বারে এসেছে। সবগুলোই কাবাবের অর্ডার বা টেবিল রিজার্ভেশন সম্পর্কিত।

একবার ভেবেছে রানা ওদের অনুপস্থিতিতে বাসার ভেতরে ঢোকার একটা চান্স নেবে কি না স্লীপার ট্র্যান্সমিটারের খোঁজে। কিন্তু পরে বাতিল করে দিয়েছে সে ইচ্ছে। মারাত্মক ঝুঁকি আছে তাতে। ও বাড়িটা নিঃসন্দেহে সিকিউরিটি অ্যালার্মের কারখানা। হেজিপেজি নয় ওরা

দু'ভাই, টপ ক্লাস স্লীপার এজেন্ট। নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপার ভালই বোঝে। তিল পরিমাণ এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই বরবাদ হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। এগারোটা। চোখ তুলতেই গ্রীক যমজের ওপর চোখ পড়ল। বেরিয়ে আসছে বাসা থেকে। কাজে যাওয়ার সময় হয়েছে। কি কারণে কে জানে, হাসছে খুব দু'ভাই। গাড়ি বের করে রওনা হয়ে গেল অ্যানড্রিয়াস ও স্পিরিডন স্টেফানিডেস ওরফে কোস্টাপোপোলাস যমজ। বলতে হলো না, অপেক্ষমাণ পুলিসের দুই ওয়াচার এবং বিএসএসের হ্যারি নিগেল বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সবার ডিউটি ভাগ-ভাগ করে দিয়েছে মাসুদ রানা। কাউকে যদি দেখে ফেলে ওরা দেখুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু একবারের বেশি দু'বার যাতে চোখে না পড়ে সে, ফেউ বলে তাকে সন্দেহ করতে না পারে ওরা দু'ভাই, সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ রয়েছে সবার ওপরে।

পরদিন ফিনএয়ারের একটি জেট অবতরণ করল হিথ্রো। সরাসরি হেলসিঙ্কি থেকে এসেছে। যাত্রীরা সব ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস্ পেরিয়ে এল। কারও কাগজপত্রে কোনরকম গণ্ডগোল নেই। ওর মধ্যে একজন; লম্বা, গাল ভর্তি চাপ দাড়ি, মাঝবয়সী লোক রয়েছে। ফিনিশ পাসপোর্টের অধিকারী। পাসপোর্ট অনুযায়ী উরহো নুটিলা তার নাম।

ফিন ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে লোকটা, বাধে না একটুও। কারণ তার মা ক্যারেলিয়ান। বাবা রুশ। জন্মগতভাবে লোকটা রুশ। সেমিয়ানভ নাম। পেশাঃ সোভিয়েত অর্ডন্যান্স ডিরেক্টরেটের আর্মি আর্টিলারি কোরের কর্ণেল। আসলে লোকটা যতটা না সৈনিক, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞানী নিউক্লিয়ার এঞ্জিনিয়ার। ফিনদের মত চলনসই ইংরেজি বলতে পারে লোকটা।

কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে এয়ারপোর্টের কার্টসি কোচে এসে উঠল সেমিয়ানভ অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। হিথ্রোর পেন্টা হোটেলে এসে থামল বাস। ভেতরে ঢুকল সে। কিন্তু রিসেপশন ডেস্কে গেল না। সামনে দিয়ে 'কাটি' মেরে সোজা রিয়ার এক্সিটে চলে এল। দরজা দিয়ে বেরোলেই সামনে হোটেলের কার পার্ক। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হলো সেমিয়ানভকে। কেউ নেই ধারে কাছে।

ধীরগতিতে কাছে এসে দাঁড়াল একটা ফ্যামিলি সেলুন। জানালার কাঁচ নামিয়ে প্রশ্ন করল ওটার চালক, 'এয়ারপোর্টের বাস কি এখানেই যাত্রী নামায়?'

'না। সামনেই নামিয়েছে,' বলল কর্ণেল।

'কোত্থেকে এসেছেন আপনি?'

'ফিনল্যাণ্ড।'

'আই সী! ওখানে নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা এখন?'

'নাহ্! খুব গরম। ওটা আসলে সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে মশা।'

মাথা ঝাঁকাল তাতায়েভ। সামনে দিয়ে ঘুরে ওপাশের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল এঞ্জিনিয়ার। গাড়ি ছাড়ল মেজর। বিনা বাক্য ব্যয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল। মাইলখানেক এগিয়ে প্রশ্ন করল তাতায়েভ, 'আপনার নাম?'

'সেমিয়ানভ।'

'ওতেই চলবে, আর কিছু দরকার নেই। আমি ফ্ল্যানারি। মার্টিন ফ্ল্যানারি।'

'বেশি দূরে যেতে হবে আমাদের?'

'দুই ঘণ্টার পথ।'

বাকি পথ দু'জনের কোন কথা হলো না। তিন জায়গায় তিনটে বেসিক ট্রিক খাটাল তাতায়েভ পিছনে কেউ লেগেছে কি না বোঝার জন্যে। কিন্তু

না, লাগেনি। চেরিহে'জ ক্লোজে যখন পৌঁছল ওরা, দিনের আলো তখন সামান্যই বাকি। সামনের বাসার ভাড়াটে ডানকান রস তার বাগানের পরিচর্যা করছিল, ফ্ল্যানারির সঙ্গে নতুন একজনকে দেখে এগিয়ে এল সে।

'হেড অফিস,' তার উদ্দেশে চোখ টিপল তাতায়েভ। 'মনে হচ্ছে প্রমোশনের ব্যাপার-স্যাপার।'

হেসে শুভেচ্ছা জানাবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে।

বাতি জ্বালার আগে ঘরের কার্টেন ভাল করে টেনে দিল ভ্যালেরি তাতায়েভ। কার্টেন না টেনে কখনোই বাতি জ্বালে না সে।

'আগে কাজের কথা হোক,' বলল কর্ণেল।

মাথা দোলাল মেজর, 'হোক।'

'চালান সবগুলো হাতে পেয়েছেন আপনি?'

'পেয়েছি।'

'নয়টা?'

'নয়টা।'

'লেট'স কনফার্ম। বাচ্চাদের খেলার বল একটা। ওজন বিশ কিলোগ্রাম।'

'চেক্।'

'এক জোড়া জুতো, এক বাক্স চুরুট, একটা প্লাস্টার কাস্ট।'

'চেক্।'

'একটা পোর্টেবল্ ট্র্যানজিস্টর সেট, একটা ইলেক্ট্রিক শেভার।'

'চেক্।'

'একটা দেড় ফুট লম্বা স্টীল টিউব, একটা ছোট ফায়ার এক্সটিঙগুইশার। দুটোই অস্বাভাবিক ভারি।'

'চেক্।'

'এক জোড়া হেড ল্যাম্প বাউল, খুব ভারি।'

'চেক্।'

'ঠিকই আছে তাহলে। অন্য সব টুকটাক কেনাকাটা যদি সারা হয়ে থাকে, তাহলে কাল সকালে হাত দেব কাজে।'

'এখনই নয় কেন?'

'ইয়ংম্যান, কাঠ কাটা, ড্রিল করা, এসবে শব্দ হয়। আরও এখন রাত। তাছাড়া আমি ক্লান্ত। যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে সামান্যতম ভুল হলেই সর্বনাশ। তাই এখন নয়। কাল সন্ধে নাগাদ সেরে ফেলতে পারব কাজটা, আশা করি।'

মাথা দোলাল মেজর।

দশ

সীটিং রুমেই কাজ করবে ঠিক করল সেমিয়ানভ। মেঝেয় বসে অবশ্যই। তাকে সাহায্য করার জন্যে বসে আছে তাতায়েভ। 'প্রথমে গারবেজ ব্যাগ চাই একটা,' বলল সেমিয়ানভ। সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো নির্দেশ।

'এবার আমি যেটা যেটা চাইব, এগিয়ে দিন এক এক করে,' বলল সে। 'প্রথমে চুরুটের বাক্স।'

ওটা হাতে নিয়ে সীল খুলল অ্যাসেম্বলার। ঢাকনা তুলল। ভেতরে পঁচিশটা চুরুট। নিচের সারিতে বারোটা, ওপরে তেরোটা। প্রতিটি আলাদা আলাদা অ্যালুমিনিয়ামের মুখ-বন্ধ টিউবে মোড়া। টিউব কেটে

বের করতে হয় ওগুলো। 'নিচের সারির বাঁ দিক থেকে তৃতীয়টা,' নিজের মনে বলল সে।

ওটা বের করে ব্লেড দিয়ে কেসিঙটা কেটে ফেলল সেমিয়ানভ। তারপর আলতো এক পোচে চুরুটের এ মাথা ও মাথা কেটে তামাকের ভেতর থেকে বের করে আনল ইঞ্চি দুয়েক লম্বা, সরু কাঁচের শিশি। ওর এক মাথা কোঁচকানো। ভেতর থেকে দুটো প্যাঁচানো, শক্ত তার বেরিয়ে আছে। 'ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটর,' তাতায়েভকে শুনিয়ে উচ্চারণ করল বিজ্ঞানী। ওটা বাদে আর সব গারবেজ ব্যাগে ভরল সে।

'প্লাস্টার কাস্ট।'

ওটা তৈরি দুই স্তর প্লাস্টার দিয়ে। প্রথম স্তর শক্ত হওয়ার পর ওপরে আরও এক স্তর জোড়া হয়েছে। দুটোর ভেতর রয়েছে ছাই রঙের পাটির মত নরম কিছু একটার আরেক স্তর। প্লাস্টারের আঁঠার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে পলিথিনে মুড়ে মাঝে স্থাপন করা হয়েছে জিনিসটা। প্লাস্টার অভ প্যারিসের দুটো স্তর আলাদা করল সেমিয়ানভ। পলিথিন প্যাকেটটা বের করে ওটা থেকে খসিয়ে নিল নরম জিনিসটা। তারপর জিনিসটা দলা করে মুঠোয় পুরে চেপে চেপে বল বানাতে বানাতে বলল, 'হাফ পাউণ্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।'

পুরো প্লাস্টার স্থান পেল গারবেজ ব্যাগে।

'এবার জুতোজোড়া।'

দুটোরই হিল বিচ্ছিন্ন করে ফেলল সেমিয়ানভ। একটায় পাওয়া গেল দুই ইঞ্চি ডায়া, এক ইঞ্চি পুরু একটা স্টীল ডিস্ক। ওটার রিম প্যাঁচ কাটা। সমতল পিঠের একদিকে এ মাথা ও মাথা গভীর খাঁজ। চওড়া মাথায় স্ক্রু-ড্রাইভার ধারণ করার জন্যে কাটা হয়েছে খাঁজটা। অন্যটার ভেতর আছে আরেক গ্রে-মেটাল ডিস্ক। এটাও দুই ইঞ্চি ডায়ার।

'লিথিয়াম,' পরেরটা দেখিয়ে ঘোষণা করল বিজ্ঞানী। 'ইনিশিয়েটর। অ্যাটমিক পাওয়ারকে ফুল ফোর্সে বিস্ফোরিত হতে সহায়তা করবে।' জুতো এবং হিলের অবশিষ্টাংশ ফেলে দিল সে ব্যাগে।

'শেভার।'

ওর ভেতর থেকে বেরোল বিকল্প পোলোনিয়াম ডিস্কটি। গ্লাসগোয় ডেকহ্যাণ্ড পাভলভ এরই পয়লা চালানটি খুইয়েছিল। এটার ব্যাপারে রানিং কমেন্ট্রি দিতে ভুলে গেল বিজ্ঞানী। এরপর হিট রেজিসট্যান্ট প্যাড খুলে ভেতর থেকে দেড় ফুট লম্বা, বিশ কেজি ওজনের স্টীল টিউবটা বের করার কাজে লেগে গেল।

চার ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটা টিউব ওটা। হার্ডেনড্ স্টীলের তৈরি, এক মাথা খোলা টিউব। ভেতরে দুই ইঞ্চি ফাঁকা, এক ইঞ্চি পুরু স্টীলের তৈরি জিনিসটা। টিউবের উন্মুক্ত মাথার ভেতরদিকটা প্যাঁচ কাটা। অন্য প্রান্তে স্টীলের সংযুক্ত ক্যাপ পরানো, ঠিক মাঝখানে ছোট একটা ফুটো আছে ক্যাপটার। কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করার ফলে কথা বন্ধ হয়ে গেছে সেমিয়ানভের। নীরবে হাত চলছে তার। তাতায়েভ হাঁ করে দেখছে লোকটার কাজ।

ফার্স্ট অফিসার ভলকভের পোর্টেবল থেকে বের হলো টাইমার ডিভাইস। আকার দুটো ফাইভ-ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট লম্বালম্বিভাবে জুড়লে যতটা দীর্ঘ হয়, ততটা। পাশেও তেমনি। দুই সমতল মাথার একদিকে আছে দুটো সুইচ। একটা হলুদ, অন্যটা লাল। আরেক মাথা দিয়ে বেরিয়ে আছে দুটো রঙিন তার; নেগেটিভ, পজিটিভ। ওটার চার কোণে চারটে ফুটো। যে স্টীল কেবিনেটে রাখা হবে তৈরি বোমা, ওটার দরজার সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে জুড়ে দেয়ার সুবিধের জন্যে।

এবার ফায়ার এক্সটিংগুইশার। ওর তলাটা কাটা, প্যাঁচ কষে

লাগানো। কাজটা এত নিখুঁতভাবে সারা হয়েছে যে চোখেই পড়েনি কাস্টমসের। ওটাই স্বাভাবিক, কারণ কাটা মুখ যাতে সহজে চোখে না পড়ে সে জন্যে নতুন করে পুরু রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছিল পুরো জিনিসটায়। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মোটা প্যাড বের করল সেমিয়ানভ। প্যাডের ভেতর রয়েছে সীসার মত দেখতে একটা ধাতব রড। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, দুই ইঞ্চি ডায়া। ওজন সাড়ে চার কেজি। ওটা স্পর্শ করার আগে হেভি ডিউটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্লাভস পরে নিল বোমা বিশেষজ্ঞ। কারণ ওটা খাঁটি ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ।

'জিনিসটা রেডিওঅ্যাকটিভ, তাই না?' প্রশ্ন করল মোহাচ্ছন্ন তাতায়েভ।

'হ্যাঁ।'

'ডেঞ্জারাস?'

'ততটা নয়। সবাই ভাবে রেডিওঅ্যাকটিভ মানেই বুঝি বিপজ্জনক, আসলে তা নয়। লিউমিনাস হাতঘড়িও রেডিওঅ্যাকটিভ, কিন্তু আমরা তা হাতে পরি। ইউরেনিয়াম আসলে আলফা-এমিটার, লো-লেভেল। তেমন তেজস্ক্রিয় কিছু নয়। এটা বিপদজনক হয়ে উঠবে তখনই, যখন বোমাটা ফাটবে।'

এবার হেডল্যাম্প বাউল দুটো মুক্ত করল সে ইউনিট থেকে। দুটো অর্ধবৃত্ত, এক ইঞ্চি পুরু হার্ডেণ্ড স্টীলে তৈরি বাউল। দুটোরই প্রান্ত বাইরের দিকে সামান্য ভাঁজ করা, ষোলোটা করে ছিদ্র আছে তাতে পরস্পরের সঙ্গে নাট-বোল্ট দিয়ে যুক্ত করার জন্যে। দুটো এক হলে নিখুঁত একটা গ্লোব তৈরি হবে।

একটা বাউলের পিছনদিকে, ঠিক মধ্যিখানে দুই ইঞ্চি ডায়ার ছিদ্র আছে, ভেতরটা প্যাঁচ কাটা। প্রথম জুতোর হিল থেকে বের হওয়া খাঁজ কাটা স্টীল ডিস্কটা সময়মত নিখুঁতভাবে ফিট্ হবে ওই ছিদ্রে। অন্য

বাউলের একই জায়গায় দুই ইঞ্চি ডায়ার খাটো একটা রড ঠেলে বেরিয়ে আছে। রডটা প্যাঁচ কাটা, যাতে হ্যানোমাগ জাগারনাটে করে বয়ে আনা দেড় ফুটি পাইপটার প্যাঁচ কাটা প্রান্তে জুড়ে দেয়া যায় ওটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

সবশেষের আইটেমটি জার্মান ক্যাম্পার ভ্যান মালিকের ছেলেমেয়ের খেলার বল। ওপরের রঙচঙে রাবারের খোলটা কেটে ফেলল সেমিয়ানভ। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল আরেকটা ধাতব বল, ত্রিশ কেজি ওজনের। এটাও ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ। আবার রানিং কমেন্ট্রি দেয়ার কথা খেয়াল হলো বিজ্ঞানীর। 'এটা ইউরেনিয়ামের একটা বল, ওপরটা পাতলা সীসা দিয়ে মোড়া।'

সবগুলো কমপোনেন্টের ওপর নজর বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো নিউক্লিয়ার সাইনটিস্ট। এবার স্টীলের ফাইলিং কেবিনেট নিয়ে পড়ল সে। ওটাকে মেঝের ওপর শুইয়ে দরজা হাট্ করে খুলে রাখল। তারপর খুদে কড়িকাঠ ও ব্যাটন দিয়ে ওটার ভেতরে একটা ইনার ফ্রেম তৈরি করল। ফ্রেমটা মুড়ে দিল সে পুরু শক্-অ্যাবজরবেন্ট ফোম রাবার দিয়ে।

'দু'পাশে এবং ওপরেও ফোম জুড়বার ব্যবস্থা করতে হবে পরে,' ব্যাখ্যা করল সেমিয়ানভ। 'বোমা ভেতরে সেট করার পর।'

ব্যাটারি চারটে পাশাপাশি সাজিয়ে একটার সঙ্গে অন্যটার টার্মিনাল পেঁচিয়ে লাগাতে আরম্ভ করল এবার লোকটা। তারপর মাস্কিং টেপ দিয়ে সবগুলো ব্যাটারি গায়ে গায়ে লাগিয়ে শক্ত করে আটকে দিল যাতে একটা অন্যটা থেকে আলাদা হতে না পারে। ড্রিল মেশিন দিয়ে কেবিনেটের দরজায় চারটে ছিদ্র করল সে। তারপর দরজার ভেতরদিকে ব্যাটারি ব্লকটা ঠেকিয়ে ফুটোর মধ্যে দিয়ে তার কয়েকবার করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জুড়ে দিল ওটা দরজার সঙ্গে। তখন মাঝ দুপুর।

'নিউক্লিয়ার বোমা দেখেছেন কখনও?' প্রশ্ন করল সেমিয়ানভ।

'না,' ফ্যাসফেঁসে শোনাল তাতায়েভের কণ্ঠ। আন-আর্মড কমব্যাটে সে একজন এক্সপার্ট। পিস্তল-ছুরি চালনাতেও 'এ' ক্লাস সার্টিফিকেট রয়েছে তার। কিন্তু এই মাঠে একেবারেই আনাড়ি। একটা ছোটখাট শহর উড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে যে জিনিসগুলো, তা নিয়ে সেমিয়ানভ ঠাণ্ডা মাথায় যে-সব কাণ্ড করছে, দেখে গলা শুকিয়ে এসেছে তার।

'এক সময় ছিল, যখন এ কাজ ছিল খুবই কঠিন। খুব অল্প শক্তির নিউক্লিয়ার বোমাও আকারে বিশাল হত। ল্যাবরেটরির সাহায্য ছাড়া তৈরি করার কথা ভাবাও যেত না। কিন্তু সে দিন আর নেই। একটা বেসিক অ্যাটমিক বোমা আজকাল একটা ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর বসেও তৈরি করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় কমপোনেন্ট, একটু সতর্কতা, আর নোহাউ, এই তিনটে হলেই হলো।'

'তাই তো দেখছি,' ঢোক গিলল তাতায়েভ।

ইউরেনিয়াম বলের ওপরকার পাতলা সীসার আবরণ কেটে ফেলল সেমিয়ানভ। আসল জিনিসের ওপর চোখ বোলাল। বলটা পাঁচ ইঞ্চি ডায়ার। ঠিক মধ্যিখানে দুই ইঞ্চি ডায়ার এক ফুটো, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। একদিকে চার-পাঁচটা হালকা গর্ত আছে বলটার গায়ে।

'এর কি কাজ জানতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'বোমার সুইচ অন্ করা হলে এটা ফিজ করতে আরম্ভ করে। কোল্ড ড্রিঙ্কস্ বা শ্যাম্পেন গ্লাসে ঢালার পর যেমন মৃদু হিস্ হিস্ আওয়াজ ওঠে, ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। আপনাকে বোঝাবার জন্যে বলছি, শব্দ কিন্তু আসলে হয় না। ফিজ করে ঠিকই, তবে সেটা রেডিওঅ্যাকটিভ টার্মে। ওই ফিজ গিয়ে আঘাত করে ডেটোনেটরে,' মেজরকে ঠোঁট চাটতে দেখে দ্রুত যোগ করল সেমিয়ানভ, 'না, এখনই তেমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে না। পুরোটা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ভয়ের কিছু নেই।'

'গ্রেট।'

'এই যে এটা,' ফায়ার এক্সটিংগুইশার থেকে বের করা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা রডটা তুলে নিল বিজ্ঞানী। 'বলের এই ফুটো দিয়ে যখন ঢুকিয়ে দেয়া হবে এই রড, তখন ক্রিটিক্যাল পর্যায়ে পৌঁছবে জিনিসটা। ওই যে দেড় ফুট লম্বা টিউব, বন্দুকের নলের মত, ওর ভেতর দিয়ে বুলেটের বেগে ছুটবে এই রডটা। যখন...'

'বুম!' সমঝদারের মত মাথা দোলাল ভ্যালেরি তাতায়েভ।

ঠোঁট মুড়ে হাসল সেমিয়ানভ। 'নট কোয়াইট। বুম হবে, তবে যখন ইনিশিয়েটর সেট করা থাকবে তখন। ওই যে লিথিয়াম আর পলোনিয়ামের দুই ডিস্ক, ও দুটোই হলো সেই জিনিস। দুটো আলাদা আলাদা যতক্ষণ আছে, চিন্তা নেই। কিন্তু এক হলেই বদ কম্মটি ঘটিয়ে বসবে। রিঅ্যাকশন ঘটতে শুরু করবে। ঝড়ের বেগে নিউট্রন ছড়াতে শুরু করবে ওরা। এবং এই ইউরেনিয়াম বল ও টিউব অবিশ্বাস্য শক্তিতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে নিজেদের। অ্যাণ্ড দ্যাট উইল টেক ওয়ান হাণ্ড্রেড মিলিয়নথ্ অভ আ সেকেণ্ড।'

'বুঝলাম না। আরেকটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন।'

'বেশ।' মুখ দেখে মনে হলো ওস্তাদি দেখাবার সুযোগ পেয়ে খুশিই হয়েছে নিউক্লিয়ার সাইনটিস্ট। 'দেখতে থাকুন।'

পলোনিয়াম ডিস্কটার এক পিঠে এক ফোঁটা সুপারগ্লু লাগাল বিজ্ঞানী, তারপর জুতোর হিল থেকে সংগৃহীত খাঁজ কাটা স্টীল ডিস্কের সঙ্গে জুড়ে দিল ওটা। পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে গেল ডিস্ক দুটো। এবার পলোনিয়াম চাকতিটা ভেতর দিকে রেখে দুই হেড ল্যাম্প বাউলের মধ্যে যেটার প্যাঁচ কাটা ফুটো আছে পিছনে, সেটার সঙ্গে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে টাইট করে লাগিয়ে দিল সে স্টীল ডিস্ক। এরপর বাউলটা চিত করে

ইউরেনিয়াম বলটা রাখল তার পেটের ভেতর। পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকল পলোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম।

বাউলের ভেতরে চার-পাঁচটা খুদে ঢিপিমত আছে। বলের গর্তগুলোর মধ্যে ঢুকে গেল ঢিপিগুলো নিখুঁতভাবে। একচুলও নড়ছে না এখন বল। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে বলের ছিদ্র দিয়ে তলার দিকটা দেখল বিজ্ঞানী। বলের দুই ইঞ্চি ডায়া ছিদ্রের সঙ্গে তলায় বসানো দুই ইঞ্চি ডায়ার পলোনিয়াম ডিস্কটা একদম মুখে মুখে সেট হয়েছে।

এবার অন্য বাউলটা তার ওপর উপুড় করে বসাল সেমিয়ানভ। একটা গোলকের আকার পেয়েছে এখন বাউলজোড়া। ষোলোটা নাট-বোল্ট জুড়ে বাউল দুটো যুক্ত করল সে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজটা সারতে হলো তাকে। সময় ব্যয় হলো পুরো এক ঘণ্টা।

'এইবার বন্দুক,' মন্তব্য করল বিজ্ঞানী।

দেড় ফুটি টিউবটা তুলে নিল সে। দলা পাকানো আধ পাউণ্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ঢুকিয়ে দিল ভেতরে খোলা মুখ দিয়ে। কিচেন থেকে লম্বা হাতলওয়ালা একটা ঝাড়ু আনাল সে তাতায়েভকে দিয়ে, ওটার হাতল দিয়ে তলার দিকে যতটা যায়, চেপে চেপে, ঠেসে ঢোকানো হলো বলটা। তারপর টর্চ জ্বেলে ভেতরটা দেখল আবার সেমিয়ানভ। মাথা দোলাল, সন্তুষ্ট হয়ে।

এবার সুপারগ্লুর সাহায্যে পাঁচ ইঞ্চি ইউরেনিয়াম রডের এক মাথায় দ্বিতীয় জুতো থেকে পাওয়া লিথিয়াম ডিস্কটি সাঁটিয়ে দিল সে শক্ত করে। শক্ অ্যাবজরবিঙ টিস্যু দিয়ে খুব ভাল করে মুড়ে নিল ও দুটো, তারপর ডিস্ক নিচের দিকে রেখে রডটা সেঁধিয়ে দিল টিউবে, ঝাড়ুর হাতল দিয়ে ঠেসে তলায় বসানো প্লাস্টিকের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিল লিথিয়াম ডিস্ক। টিস্যু দিয়ে মোড়া হলো যাতে ভাইব্রেশনের ফলে পিছলে সামনে চলে আসতে

না পারে ওটা। সংযোগটা মজবুত করার জন্যে আরও খানিক চাপাচাপি করা হলো জিনিসটা হাতল দিয়ে। একসময় সন্তুষ্ট হলো বিজ্ঞানী, দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়েছে ও দুটো।

এবার যে বাউলটির পিছনদিকটায় প্যাঁচ কাটা দুই ইঞ্চি রডমত আছে, টিউবের উন্মুক্ত প্রান্তের ভেতরের থ্রেডের সঙ্গে যতদূর সম্ভব শক্ত করে আটকে দেয়া হলো সেদিকটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। জিনিসটা দেখতে হলো একটা ব্যাটনের মাথায় সাত ইঞ্চি ব্যাসের একটা বল বসিয়ে প্রস্তুত অর্থহীন কিছু একটার মত। বা বড় আকারের স্টিক গ্রেনেডের মত।

'হয়ে এসেছে প্রায়,' বলল সেমিয়ানভ। 'বাকিটুকু সেরে নিয়ে বলছি।'

সরু শিশির মত দেখতে কাঁচের ডেটোনেটরটা তুলে নিল সে এবার। এক মাথা দিয়ে বেরিয়ে থাকা রঙিন তার দুটো নিরাপত্তার খাতিরে টেনে সরিয়ে দিল দু'দিকে। ফাইভ এএমপি ফ্লেক্সের রোল থেকে এক ফুট আকারের দুটো খণ্ড বের করে কালার কোড অনুযায়ী ডেটোনেটরের দুই তারের সঙ্গে ওগুলোর এক প্রান্ত করে জুড়ে দিল সে। জোড়া দুটো মাস্কিং টেপ দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে মুড়ে ফেলল সেমিয়ানভ।

বেখেয়ালে কাজের সময় যদি একটা অন্যটার ছোঁয়া পায়, প্রিম্যাচিওর ডেটোনেশন ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এবার টিউবের সীলড তলার মাঝখানে যে ছোট ছিদ্র, ওটা দিয়ে ডেটোনেটরের কোঁচকানো, সুচোল মাথাটা আলতো করে ঢুকিয়ে দিল বিজ্ঞানী। বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে মৃদু মৃদু চাপ দিতে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের ভেতরে ঢুকে গেল ওর প্রান্ত। পরখ করে দেখল সেমিয়ানভ, ঠিকমতই বিঁধেছে। নড়াচড়া করছে না।

আস্ত বোমাটা আলগোছে কেবিনেটের ভেতরে প্যাডের বিছানায় শুইয়ে দিল এবার লোকটা। আরও এক ফুট ফ্লেক্স কাটল সে কয়েল থেকে। ওটার এক মাথা ব্যাটারি ব্লকের পজিটিভ টার্মিন্যালের সঙ্গে আটকে টেপ পেঁচিয়ে দিল। অন্য মাথা পড়ে থাকল পাশে, পরে কাজে লাগবে।

ডেটোনেটরের দুই তার দু'হাতে তুলে তাতায়েভের দিকে তাকাল নিউক্লিয়ার সাইনটিস্ট। দাড়ির ফাঁকে মধুর হাসি। 'এখন,' বলল সে, 'যদি এই দুটি তার ওপরের আবরণ কেটে ফেলার পর কোনমতে এক হয়, দ্যাট উইল স্পেল ব্যাড নিউজ। এই যে ডেটোনেটর, এটা অ্যাকটিভেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটুকু ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এই উত্তাপ প্রথমে লিথিয়ামকে এবং লিথিয়াম ইউরেনিয়াম রডটিকে ওপরদিকে সজোরে ঠেলে দেবে। ফিজ শুরু হয়ে যাবে তার আগেই।

'এই দুই শক্তি টিউবের গা ঘেঁষে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে টিউবের মাথার ফুটো গলে ঢুকে পড়বে এই বলের ভেতর, এবং প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেদের একসঙ্গে বিস্ফোরিত করবে ওরা সবাই। দ্যাট'স ইট।'

টাইমার ডিভাইসে হাত লাগায়নি এখনও সেমিয়ানভ। পাশেই সঙ্গীহীন পড়ে আছে ওটা। হাই-স্পীড ড্রিল মেশিনের সাহায্যে ফাইলিং কেবিনেটের দরজায় আরও পাঁচটা ফুটো করল সে। চার কোণে চারটে, মাঝখানে একটা। ডেটোনেটরের সঙ্গে লাগানো ফ্লেক্সের একটা ব্যাটারি ব্লকের নেগেটিভ টার্মিন্যালে জুড়ল এবার বিজ্ঞানী। তারপর পজিটিভ টার্মিন্যালে আগেই লাগানো ফ্লেক্সের এক মাথা এবং ডেটোনেটরের অন্য ফ্লেক্সটির মাথা মাঝখানের ফুটোটা গলিয়ে দরজার বাইরে নিয়ে এল।

এরপর ঝাঁকি বা দুলুনিতে বোমা যাতে নড়াচড়া করতে না পারে, সেজন্যে ওটার চারদিকে আচ্ছা করে ফোম ইনসুলিশন চাপাল সেমিয়ানভ, একেবারে ভরে ফেলল খুদে কেবিনেট। টাইমার ডিভাইসটা চার ফুটোয় চারটে স্ক্রু বসিয়ে ফিট্ করল সে আস্তে ধীরে। ভাল করে কষে প্যাঁচ এঁটে দিল। টেনেটুনে দেখল বেশ মজবুত হয়েছে সংযোগটা। এবার কালার কোড মিলিয়ে টাইমারের সঙ্গে ফ্লেক্স দুটো জুড়ে দিল লোকটা। তাতায়েভের নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার শব্দে হেসে অভয় দিয়ে বলল সে,

'ভয়ের কিচ্ছু নেই। এই টাইমার পাঠানোর আগে বহুবার চেক্ করে দেখা হয়েছে। কাটআউট বা সার্কিট-ব্রেকারে কোন খুঁত নেই এর।'

টাইমার-ফ্লেক্সের সংযোগ প্রচুর টেপ খরচ করে জোড়া লাগাল বিজ্ঞানী। কেবিনেটের দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল। এবং সবশেষে চাবিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল টোকা মেরে। 'হিয়ার ইট ইজ, ক্যাচ!'

ফোঁস করে চেপে রাখা দম ছাড়ল ভ্যালেরি তাতায়েভ। লুফে নিল চাবিটা, চালান করে দিল ট্রাউজারের পকেটে।

'সো, কমরেড ফ্ল্যানারি, আমার কর্তব্য শেষ। ট্রলিতে বসিয়ে কেবিনেটটা যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারেন, বোমার কোন ক্ষতি হবে না তাতে। চাইলে গাড়িতে উঠিয়ে লম্বা একটা ড্রাইভ দিয়েও আসতে পারেন, তাতেও কিছু আসবে যাবে না। আর এই যে,' টাইমারের হলুদ সুইচটা দেখাল সেমিয়ানভ। 'এটা পুশ করলে শুরু হয়ে যাবে কাজ। তবে ইলেকট্রিক সার্কিট পুরো হতে দু'ঘণ্টা লাগবে এটার ক্ষেত্রে। কারণ সে ভাবেই সেট করা হয়েছে ডিভাইস। আপনার জন্যে। এই সময়ের মধ্যে যাতে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারেন আপনি, সেই জন্যে। ঠিক দু'ঘণ্টা পর ফাটবে বোমা।

'আর লালটা ম্যানুয়াল ওভাররাইড। তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে।'

নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্টের জানা নেই যে কথাটা আদৌ সত্যি নয়। তাকে যা বলা হয়েছে, তাই সে বলে গেছে। আসলে হলুদে আর লালে কোন তফাৎ নেই, দুটোই ম্যানুয়াল ওভাররাইড—সেট করা হয়েছে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের জন্যে।

আঁধার হয়ে গেছে বাইরে। আলো জ্বেলে দিল তাতায়েভ। অপ্রয়োজনীয় সবকিছু গারবেজ ব্যাগে ভরে ফেলেছে ততক্ষণে বিজ্ঞানী। 'এবার পেটে কিছু না দিলেই নয়, কমরেড,' বলল সে। 'সঙ্গে দু'চার পেগ

হুইস্কি হলে ভাল হয়। তারপর লম্বা ঘুম দিয়ে সকালে ফিরতি পথ ধরতে চাই।'

'নিশ্চই নিশ্চই।'

পরদিন সকালে সেমিয়ানভকে নিয়ে হিথ্রো রওনা হলো ভ্যালেরি তাতায়েভ। কলচেস্টারের দক্ষিণ পশ্চিমের এক ঘন বন অতিক্রম করার সময় পথের পাশে সেলুন দাঁড় করাল মেজর। তলপেটের ভার মুক্ত না করে পারা যাচ্ছে না। বনের ভেতর ঢুকল সে কাজ সারতে। কয়েক মুহূর্ত পর তার চাপা কণ্ঠের আর্ত চিৎকারে চমকে উঠল সেমিয়ানভ, গাড়ি থেকে নেমেই তীরবেগে ছুটল আওয়াজ লক্ষ্য করে।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে বুঝল বোকা বিজ্ঞানী, কি ভুল সে করেছে। ঘাড়ের ওপর কারাতের ভয়ঙ্কর এক কোপ খেয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা। মৃত্যু হয়েছে তার দেহ মাটি স্পর্শ করার আগেই। মৃতদেহটা টেনে খানিকটা গভীরে নিয়ে গেল তাতায়েভ। খুলে ফেলল পরনের কাপড়-চোপড়। একটা গর্তে ফেলে ডালপালা দিয়ে লাশটা ঢেকে ফেলল সে।

এমনিতে জানাজানির চান্স নেই। তবে পচে গন্ধ ছড়ালে খোঁজ পড়বে। তাতে চার-পাঁচদিন, এমনকি পুরো এক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে। তারপর পুলিস এনকোয়ারি হবে নিশ্চয়ই, হয়তো স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সেমিয়ানভের ছবিও ছাপা হবে। ফোলা মুখের সে চেহারা মনে হয় না চিনতে পারবে তাতায়েভের প্রতিবেশি ডানকান রস।

আর চিনতে পারলেই বা কি? সে তো তার অনেক আগেই হাওয়া হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে আরও কয়েকটা ডাল ভেঙে এনে ফেলল সে স্তূপের ওপর। তারপর বিজ্ঞানীর শার্ট-ট্রাউজার ইত্যাদি জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে তাতে ভরল মেজর। ওগুলোয় লোকটার পরিচয় লেখা নেই বটে, তবে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করলেই

বোঝা যাবে ওসব রাশিয়ায় তৈরি।

বেন্টওয়াটার্সের ধারেকাছে তাই এ জিনিস সে আবিষ্কৃত হতে দিতে পারে না। সেলুন ঘুরিয়ে ইপসউইচ ফিরে যেতে যেতে ভাবল তাতায়েভ, গারবেজ ব্যাগের সঙ্গে এগুলোরও একটা বিহিত করতে হবে তাকে আজ রাতেই। বিজ্ঞানীকে হত্যা করতে হয়েছে বলে মনে বিন্দুমাত্র আফসোস নেই ভ্যালেরি তাতায়েভের। লোকটার বিহিত করার ব্যাপারে মস্কোর নির্দেশই কেবল সে পালন করেছে, অন্য সব নির্দেশের মত। লোকটা কি করে ভাবল যে দেশে ফিরে যেতে পারবে সে, মাথায় এল না মেজরের।

অন্য সমস্যা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করল তাতায়েভ। এর মধ্যে রেনডলেসহ্যাম ফরেস্ট ঘুরে এসেছে সে দু'-দু'বার। স্পট ঠিক করে রেখে এসেছে। জায়গাটা বিমান ঘাঁটির পেরিমিটার ফেন্সের মাত্র একশো গজ তফাতে। ভোর চারটেয় ট্রলি নিয়ে পৌঁছবে সে জায়গামত, টেরটিও পাবে না কেউ। তারপর হলুদ বোতামটা টিপে দিয়ে বিজ্ঞানীর মতই তার কর্মটিকেও ভালমত ডালপালা দিয়ে আড়াল করে রেখে প্রাণপণে গাড়ি হাঁকাবে লণ্ডনের উদ্দেশে।

এ সব জানা আছে কেজিবির তুখোড় ইললিগ্যালস ভ্যালেরি তাতায়েভের। কেবল জানা নেই কোন দিন বোমা ফাটাতে হবে। ওটা তাকে জেনে নিতে হবে। সব প্রস্তুত, কাজেই আজই তাকে স্কোয়ার্ট মেসেজ ট্র্যান্সমিট করতে হবে। তারপর প্রতিরাতে রেডিও মস্কো থেকে প্রচারিত ইংরেজি ভাষার অনুষ্ঠান, বিশেষ করে রাত দশটার খবরের প্রথম নিউজ আইটেমটা শুনতে হবে তাকে। খবর-পাঠকই জানাবে তাকে কবে কাজটা করতে হবে। প্রথম আইটেম পাঠ করার শুরুতেই ইচ্ছেকৃত একটা ভুল করবে সে। ওটাই তার সঙ্কেত। ওই রাতেই ঝামেলা শেষ করে ভাগবে মেজর প্রাণ নিয়ে।

আজই শেষ স্কোয়ার্ট পাঠাবে সে। আর প্রয়োজন পড়বে না। তারপর পপলার ট্র্যান্সমিটারের স্লীপার পাহারাদারের ব্যবস্থা। সে ব্যাপারেও পরিষ্কার নির্দেশ আছে মস্কোর। ভবিষ্যতে ওদের আর প্রয়োজন পড়বে না কোনদিনও। সন্ধের একটু পর চেরিহে'জ ক্লোজ ত্যাগ করল তাতায়েভ। থেটফোর্ডে পৌঁছল রাত ন'টার দিকে।

সেলুন গ্যারেজে রেখে পরনের কাপড়ের ওপরই লেদার জ্যাকেট-ট্রাউজার পরল সে। তারওপর চাপাল রেইনকোট। পায়ে দিল জ্যাকবুট। সবশেষে ভাইজরড় হেলমেট। বিএমডব্লিউ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। রওনা হলো উত্তর-পশ্চিমে, ব্রিটিশ মিডল্যাণ্ডের দিকে।

এগারো

রাত দশটা। খোলা জানালার সামনে বসে আছে মাসুদ রানা। তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে রয়েছে সামনের অন্ধকার বাড়িটির দিকে। অন্য দুই জানালায় রয়েছে আরও চারজন। এ বেলা ব্রায়ান স্মিথ, গিলটি মিয়া ও পুলিসের দুই ওয়াচার নজর রাখছে দুই গ্রীকের ওপর। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে রানার দুশ্চিন্তা। চেক স্পাইটিকে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছে কি না, সবে ভাবতে শুরু করেছে রানা, এই সময় কমিউনিকেটরে গিলটি মিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল।

'স্যার, হারামী দুটোর ন্যাজ নড়তে শুরু করেচে বোদহায়।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সিধে হলো মাসুদ রানা। অন্য সবাই একযোগে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে। 'যমজ দু'ভাইয়ের কথা বলছ?'

'ওই হলো,' উত্তর দিল গিলটি মিয়া। 'একই কতা।'

'কি হয়েছে?'

'আজব এক কাণ্ড, স্যার। একটু আগে ওদের টেলিফোনে দু'বার রিঙ বেজে থেমে গেচে। এক মিনিট পর ফের দু'বার বেজে ঠাণ্ডা মেরে গেচে। এইমাত্র আবারও ঘটেচে ব্যাপারটা। পর পর তিনবার।'

'ওরা কেউ ধরেছে টেলিফোন?' উত্তেজনায় মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে রানার।

'না, স্যার। সে চেষ্টাই করেনি কেউ...স্যার!'

'কি হয়েছে, গিলটি মিয়া?'

'স্যার, ওদের একটা বেরিয়ে আসচে পেচন্ দরজা দিয়ে। গাড়িতে গিয়ে উটেচে।'

'তুমি ওখানেই থাকো,' চাপা গলায় দ্রুত নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। 'স্মিথকে বলো অন্যদের নিয়ে ওকে ফলো করতে। লোকটা শহর ত্যাগ করছে হয়তো।'

কিন্তু না। পাঁচ মিনিট পরই সামনের রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেল মাসুদ রানা। অ্যানড্রিয়াস স্টেফানিডেস ফিরে এসেছে বাসায় অসময়ে। গাড়ি গ্যারেজে রেখে ঘরে ঢুকল সে। বন্ধ করে দিল দরজা। ভারি পর্দার ওপাশে আলোর আভাস টের পাওয়া গেল একটু পরই। তারপর সব চুপচাপ, কোন তৎপরতা নেই। কোথাও টেলিফোনও করছে না লোকটা।

এগারোটা বিশে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিল স্পিরিডন। অস্বাভাবিক! মন্তব্য করল পুলিসের এক ওয়াচার। বারোটার আগে কোনদিন এমন হতে দেখেনি সে গত তিন বছরে। ওদেরকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল মাসুদ

রানা। পুলিসের দুটো আনমার্কড ভ্যানে আছে ওরা। ধীর গতিতে ওদেরকে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘোরাঘুরি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল রানা।

এগারোটা পঁয়তাল্লিশে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরে এল স্পিরিডন। তারপর আবার নীরবতা। আলো জ্বলছে এখনও ভেতরে।

বারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি থাকতে ঘড়মড় আওয়াজ উঠল মাসুদ রানার সেটে। 'এক লোককে দেখতে পাচ্ছি, চীফ,' বলল স্মিথ চাপা কণ্ঠে।

'কোথায়?'

'ক্রস স্ট্রীট আর কম্পটন স্ট্রীট জাংশনে।'

'কি করছে?'

'কিছুই না,' উত্তর দিল গিলটি মিয়া। 'অন্ধকারে স্রেফ ডেঁড়িয়ে আচে।'

'নজর রাখো। এদিকেই আসবে ও।'

ঘরের ভেতর কালিগোলা অন্ধকার। কার্টেন সরান। জানালার কিনারা থেকে সামান্য পিছিয়ে বসেছে ওরা সবাই। সুপার স্যাম রসটনের দেয়া ক্যামেরাটা গলায় ঝোলাল মাসুদ রানা। ইনফ্রা রেড লেন্সে চোখ রেখে বাইরে তাকাল। বিশ গজ দূরের একটা লাইট পোস্ট স্পষ্ট করে তুলল ফোকাসিং নব্ ঘুরিয়ে। যদি আসে লোকটা এদিকে, যদি নয়, আসবেই সে। এবং ওর নিচে দিয়েই আসবে। তখন ছবি তুলবে ও লোকটার।

'পা বাড়িয়েছে! আপনার দিকেই যাচ্ছে, চীফ।'

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। ক্যামেরা দু'হাতে বুকের কাছে ধরা। গরম রক্তের নাচন শুরু হয়ে গেছে শিরায় শিরায়। নাক কান দিয়ে গরম ভাপ্ বেরচ্ছে।

'লম্বা ছয় ফুটের ওপরে,' বলল ব্রায়ান। 'গাঢ় রেইনকোট পরা।'

এক মিনিট পর হঠাৎ করেই লাইট পোস্টের নিচে উদয় হল দীর্ঘ কাঠামোটা। মেশিনের মত পর পর পাঁচবার শাটার টিপল মাসুদ রানা।

ফ্ল্যাশহীন ক্যামেরা নিঃশব্দে কাজ সারল তার। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে ঊনষাট নম্বর বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

মৃদু নকের আওয়াজ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। হলরুমটা অন্ধকার। দেখা গেল না কিছু। এক মুহূর্ত পরই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ক্যামেরার ব্যাক কাভার খুলে দ্রুত ফিল্মটা বের করে আনল মাসুদ রানা। কি যেন একটা মনে পড়ব পড়ব করছে ওর, অথচ পড়ছে না। লোকটার কোথায় যেন কি এক অসামঞ্জস্য চোখে পড়েছে রানার। কি সেটা?

বিএসএসের হ্যারি নিগেলের হাতে রোলটা তুলে দিল ও নীরবে। কিছু বলার প্রয়োজন হলো না। লোকটা জানে কি করতে হবে। ওটা নিয়ে স্থানীয় পুলিস ল্যাবে যাবে নিগেল। ছবি ডেভলপ করিয়ে ফিরে আসবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিগেল দুই মিনিটের ভেতর।

হঠাৎ করেই খেয়াল পড়ল রানার ব্যাপারটা। রেইনকোট! রেইনকোট কেন পরে ছিল সে? বৃষ্টির দেখা নেই, অথচ রেইনকোট! কেন? সঙ্গে নিয়ে আসা কিছু লুকিয়ে রাখার জন্যে? 'লোকটার পরনে কি ছিল, স্মিথ?'

'রেইনকোট, চীফ।'

'আর?'

'জ্যাকবুট।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। বাকি চার জনের উদ্দেশে চাপা কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেরোও সবাই! লোকটা মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। ধারেকাছেই কোথাও রেখে এসেছে ওটা। খুঁজে বের করো গিয়ে। গাড়ি নিয়ে নয়, পায়ে হেঁটে খোঁজো। ফাস্ট, ফাস্ট!'

দুদ্দাড় করে ছুটল সবাই। কমিউনিকেটরের সাহায্যে একই নির্দেশ দিল রানা বাইরের সবাইকে। 'পাওয়া গেলে ওটার রিয়ার মাডগার্ডে ডিএফ ব্লীপার প্ল্যান্ট করতে হবে,' স্মিথকে বলল ও। 'মুভ! সব রাস্তা খুঁজে

দেখো।'

কতক্ষণ থাকবে লোকটা ও বাড়িতে? ভাবতে লাগল মাসুদ রানা, দশ মিনিট, বিশ মিনিট, এক ঘণ্টা? নাকি এখনই বেরিয়ে আসবে? ইয়াল্লা! আর অন্তত কিছুক্ষণ যেন থাকে লোকটা। হাতের কাছে নিচু একটা টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল মাসুদ রানা। এ বাড়ির প্রায় প্রতিটি রুমেই টেলিফোন প্লাগ আছে। বলতে হয়নি, প্রয়োজন হতে পারে ভেবে ব্যারি ব্যাংকস্ নিজেই একটা সেট জুড়ে দিয়ে গেছেন ওদের সুবিধের জন্যে।

ঘুম ভাঙাল রানা পুলিস সুপারের। ঝড়ের বেগে কথা বলে গেল পাঁচ মিনিট। 'ডোন্ট উওরি,' ওর বক্তব্য শেষ হতে বললেন স্যাম রসটন। 'আমি এখনই বেরচ্ছি।'

বিশ মিনিট পর একজনের সাড়া পাওয়া গেল। লোকটা স্থানীয় পুলিসের ওয়াচার। 'মোটর সাইকেলটা পাওয়া গেছে, স্যার। বড় একটা বিএমডব্লিউ। কুইন স্ট্রীটের শেষ মাথায়। এঞ্জিন, এগজস্ট পাইপ এখনও গরম।'

'রেজিস্ট্রেশন নাম্বার?'

লিখে নিল রানা নম্বরটা। পুলিস স্টেশনে ফোন করে আবার সুপারকে ধরল ও। অনুরোধ করল যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে রানাকে জানানো হয়। পনেরো মিনিট পর খবর এল, ওটা ডরচেস্টারের জনৈক কম্পিউটর এঞ্জিনিয়ার মিস্টার মার্টিন ফ্ল্যানারির নামে রেজিস্টার্ড।

'আমার সন্দেহ ওটা হয় চুরি করা, নয়তো ফলস্ প্লেট। অথবা ব্লাইণ্ড অ্যাড্রেসও হতে পারে,' বলল মাসুদ রানা। 'আপনি ডরচেস্টার পুলিসের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা কনফার্ম করে আমাকে জানান, প্লীজ।'

ফোন রেখে কমিউনিকেটর তুলে নিল মাসুদ রানা। বাইকটায় ব্লীপার প্ল্যান্ট করে পুলিসের ওয়াচার দু'জনকে ফিরে আসার নির্দেশ দিল। ওদের

বাড়িটার ওপর নজর রাখার কাজে লাগিয়ে নিজে মাঠে নামতে চায়। ব্যারি ব্যাংকস্ দম্পতিকে কষ্ট স্বীকার করার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিল ও। গিলটি মিয়া, ব্রায়ান স্মিথ ও হ্যারি নিগেলকে সঙ্গে নিয়েছে ও, অন্যরা আপাতত এখানেই থাকছে। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রথম গাড়িতে রানা ও গিলটি মিয়া, অন্যটায় বাকি দু'জন। কোথায় কোন্ জাহান্নামে যায় লোকটা, কে জানে! দুটো গাড়ি সঙ্গে রাখাই ভাল।

সেন্ট মার্গারেট'স ড্রাইভে বসে আছে ওরা। অনেক দূরে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে মার্টিন ফ্ল্যানারির মোটর সাইকেলটা। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কোন খবর আসছে না পুলিস ওয়াচারদের তরফ থেকে। করে কি লোকটা বসে বসে? ভাবনাটা শেষ হয়নি রানার, এই সময় কথা বলে উঠল কমিউনিকেটর।

'হি ইজ মুভিঙ!'

'অল রাইট,' বলল রানা। 'স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সুপারকে ঠিক এক ঘণ্টা পর ইন করতে বলবেন ফিফটি নাইনে।' ড্যাশবোর্ডের ওপর যন্ত্রটা রাখল ও। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর রেইনকোট পরা দীর্ঘ ছায়াটা উদয় হলো বিএমডব্লিউর পাশে। স্টার্ট নিল দৈত্যাকার বাইক। চলতে শুরু করবে এখনই।

কোন ব্যস্ততা নেই রানার। সামনের প্যানেলে ফিট্ করা ব্লীপার কনসোলের ওপর সেঁটে আছে দৃষ্টি। জিনিসটা খুদে রাডার স্ক্রীনের মত দেখতে। উজ্জ্বল একটা বিন্দু খানিক পর পর পর্দার এক মাথায় উদয় হচ্ছে, তারপর সোজা গিয়ে ও মাথা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যান্টেড ব্লীপার মুভ করলেই ওটার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, পথ দেখাতে আরম্ভ করবে

সে।

আচমকা জার্ক করল বিন্দুটা, চলতে শুরু করেছে বিএমডব্লিউ। 'এক মাইল এগিয়ে থাকার সুযোগ দিচ্ছি ওকে,' দ্বিতীয় গাড়ির আরোহীদের জানাল মাসুদ রানা। 'তারপর।'

শহরের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে এগোচ্ছে বিন্দুটা। সময় মত গিয়ার দিল রানা, রওনা হয়ে গেল। শহর ছেড়ে এ-সিক্স সেভেনটিনে পড়ল মোটর সাইকেল, ম্যানসফিল্ড-নিউআর্কের দিকে চলেছে। ওটা যদি কার হত, খুশি হত মাসুদ রানা। দু'পেয়ে যান অনুসরণ করা মুশকিল। বিশেষ করে দিনের বেলা। প্রয়োজনে উড়ে চলে ওগুলো। তবে লোকটার বুদ্ধি আছে, এ কাজে ঠিক জিনিসটিই বেছে নিয়েছে। ওর জায়গায় রানা হলেও তাই করত।

প্রয়োজনে ইচ্ছেমত মাঠ-ঘাট পেরিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়া সম্ভব। যেখানে কার চলতে পারবে না, সে-সব জায়গায় ওগুলো চলবে তুফানের মত। ঠিক কাজই করেছে মার্টিন ফ্ল্যানারি, ওরফে যেই হোক, ভাবল রানা।

একই গতিতে ড্রাইভ করছে লোকটা, স্পীড লিমিট ব্রেক করছে না। বরং কখনও কখনও স্বাভাবিক গতির চেয়ে কম গতিতে চালাচ্ছে। বাঁক নেয়ার সময় ঘটছে ব্যাপারটা। ঘুমন্ত ম্যানসফিল্ড পেরিয়ে নিউআর্কের দিকে চলল এবার সে। শহরে নাক ঢোকাবার আগে গতি কমে এল তার। কারের সঙ্গে মোটর সাইকেলের ব্যবধান কমে আসতে লাগল খুব দ্রুত।

হেডলাইট নিভে গেল পিছনের দুই কারের। থেমে দাঁড়াল সাইড করে। সরু একটা গলিতে মোটর সাইকেল রেখে বড় রাস্তায় ফিরে এল তাতায়েভ। ঝাড়া দশ মিনিট পিছনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। পিছনে ওরাও বসে থাকল চুপ করে একটা বড় ট্রাক বাতাসে ঝড় তুলে নিউআর্কের দিকে ছুটে গেল কেবল। তারপর আর কিছু নেই।

ফিরে এসে গাড়িতে উঠল ভ্যালেরি তাতায়েভ। রওনা হয়ে গেল আবার। পিছু নিল জোড়া সেডান। মাঝে এক মাইল দূরত্ব রেখে এগোতে লাগল। ট্রেন্ট নদী পর্যন্ত চলল একনাগাড় ধাওয়া। ডানে বিশাল এক সুগার রিফাইনারি রেখে যখন শহরে পৌঁছল ওরা, তখন তিনটে বাজে। শহর ছাড়িয়ে এ-সেভেনটিন ধরল মোটর সাইকেল—স্লিফোর্ড চলেছে।

চেস্টারফিল্ড। সুপারিনটেনডেন্ট স্যাম রসটনের নেতৃত্বে বারোজন পুলিসের একটি দল কম্পটন স্ট্রীটের ঊনষাট নম্বর বাড়ির ওপর চড়াও হলো দুটো পঞ্চান্ন মিনিটে। সঙ্গে সাদা পোশাকের আরও দু'জন রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের। আর পাঁচ মিনিট আগে এলে দুটোকে খুব সহজেই পাকড়াও করা যেত। ব্যাপারটাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিলেন সুপার।

দলটা যখন বাড়ির মাত্র দশ ফুট দূরে, এই সময় আচমকা দরজা খুলে গেল। স্লীপার ট্র্যান্সমিটারটা নিয়ে বেরিয়ে আসছিল দুই ভাই। ওর মধ্যে তাতায়েভের রেকর্ড করা কোডেড স্কোয়ার্ট মেসেজটা রয়েছে, ওটা ট্র্যান্সমিট করতে যাচ্ছে তারা। অ্যানড্রিয়াস স্টেফানিডেস ছিল সামনে, পিছনে ট্র্যান্সমিটার হাতে স্পিরিডন স্টেফানিডেস। জমে গেল প্রথমজন।

সামনেই ইউনিফর্ম পরা পুলিস বাহিনী দেখে আঁতকে উঠল সে। 'পুলিস!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে সতর্ক করল ভাইকে, পরমুহূর্তে দু'পা পিছিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে, দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে বিশালদেহী দুই পুলিসও ঝাঁপ দিল, কাঁধ দিয়ে পড়ল তারা দরজার ওপর।

কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা এবং তার পিছনে দাঁড়ানো অ্যানড্রিয়াসকে নিয়ে ভেতরের সরু হলরুমে আছড়ে পড়ল তারা। কোনমতে ভারমুক্ত হয়েই দুই পুলিসের সঙ্গে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত লড়াই শুরু করে দিল অ্যানড্রিয়াস। নাকেমুখে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ভয়ঙ্কর এক আঘাত

বসিয়ে দিতেই ঠাণ্ডা মেরে গেল লোকটা।

এবার হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল অন্যরা। স্পিরিডনকে দেখা গেল না কোথাও। নিচতলার রুমগুলো সার্চ করে দোতলায় ছুটল সবাই। সবার আগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের দু'জন। লোকটাকে পাওয়া গেল বাথরুমে। ট্র্যান্সমিটারটা তার পায়ের কাছে, ফ্লোরে রাখা। ওটার প্লাগ ওয়াল সকেটে ঢোকানো। কনসোলে টকটকে লাল আলো জ্বলছে। বার্তাটা যাই হোক, পাঠাতে পেরেছে স্পিরিডন।

বিনা বাধায় ধরা দিল সে।

মেনউইথ হিল জিসিএইচকিউ লিস্নিঙ পোস্ট একটা সিগন্যাল স্কোয়ার্ট ইন্টারসেপ্ট করল দুটো সাতান্ন মিনিটে। ওটা ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে চেস্টারফিল্ডের পশ্চিম প্রান্তে ফুটবল গ্রাউণ্ডের কাছাকাছি থেকে, ব্যাপারটা জানা যেতেই সুপার স্যাম রসটনের সঙ্গে যোগাযোগ করল ওরা।

'আমি জানি,' হাসিমুখে উত্তর দিলেন সুপার। 'ধরে নিয়ে এসেছি ব্যাটাদের।'

মস্কো। ওয়ারেন্ট অফিসার রেডিও অপারেটর হেডফোন নামিয়ে পাশের টেলিপ্রিন্টার মেশিনটির দিকে তাকাল। মাথা দুলিয়ে বলল, 'দুর্বল সিগন্যাল। তবে বোঝা গেছে পরিষ্কার।'

স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে গেল মেশিনটা, টপাটপ টাইপ হয়ে চলেছে অর্থহীন একের পর এক শব্দ। ওটা থেমে পড়তে টাইপ হওয়া কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে বসল ওয়ারেন্ট অফিসার, ফিড করল ডিকোডার মেশিনে। ওর সঙ্গের কম্পিউটর চালু হলো এবার, প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে এল মূল বার্তাটা।

পড়ল তা রেডিও অপারেটর। হাসি ফুটল মুখে। টেলিফোন তুলে

একটা নাম্বার ঘোরাল সে। ও প্রান্তের সাড়া পেয়ে নিজের পরিচয় জানাল প্রথমে, তারপর যে ধরেছে ফোন তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলো। সবশেষে ঘোষণা করল ওয়ারেন্ট অফিসার, 'অরোরা ইজ ''গো''।'

স্লিফোর্ড ছেড়ে লিঙ্কনশায়ারের দিকে চলেছে এখন বিএমডব্লিউ। একসময় ওটাও অতিক্রম করল। তীরের মত সোজা হাইওয়ে ধরে ফেন কাউন্টির দিকে এগোতে লাগল। তারপর ওয়াশ এবং কাউন্টি অভ নরফোক। আরও দু'বার থেমেছিল তাতায়েভ পিছনের দিগন্তে চোখ বোলাবার জন্যে। দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচ মিনিট করে। কিন্তু দেখা পায়নি কারও।

সাটারটন গ্রামে ঢোকার মুখে খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল মাসুদ রানা। যে পথে এসেছে ওরা এতক্ষণ, সাটারটনের মাঝামাঝি জায়গায় ওয়াই-এর মত ভাগ হয়ে গেছে সেটা। ওটা থেকে দ্বিতীয় হাইওয়ে; এ-সিক্সটিন, বেরিয়ে চলে গেছে সোজা দক্ষিণে, স্পালডিঙে। আর এ-সেভেনটিন গেছে দক্ষিণ-পুবে, লঙ সাটন, তারপর নরফোক কাউন্টি বর্ডার কিংস লিন।

পুরো দু'মিনিট পর কনসোলের ব্লিপ নিশ্চিত করল এ-সেভেনটিনেই রয়েছে এখনও বিএমডব্লিউ। ততক্ষণে প্রায় তিন মাইল পিছনে পড়ে গেছে ওরা। এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল রানা ফুটবোর্ডের সঙ্গে। দুই মিনিটে স্পীডোমিটারের কাঁটা উঠে গেল নব্বইয়ে। ওই গতি বজায় রাখল রানা যতক্ষণ না আগের মত এক মাইলে নেমে এল ব্যবধান।

কিংস লিনের দক্ষিণে প্রশস্ত আওজ নদী অতিক্রম করল ওরা। ব্রিজ থেকে নেমে মাইলখানেক এগিয়েই ডানের বাই-পাস রোড ধরল মোটর সাইকেল। ডাউনহ্যাম মার্কেট হয়ে থেটফোর্ড গেছে ওটা।

'জ্বালিয়ে মারলে তো হারামজাদা,' আর সহ্য করতে না পেরে বিড়বিড় করে বলল গিলটি মিয়া।

'আর বেশি দেরি নেই,' বলল রানা। 'আশেপাশেই কোথাও ঘাটি ওর যতদূর মনে হয়। আলো ফোটার আগেই সেখানে পৌঁছতে চাইবে লোকটা।'

কিন্তু রানার ধারণায় ভুল ছিল। আলো ফুটতে শুরু করেছে। এখনও চলছে তো চলছেই মোটর সাইকেল, থামার লক্ষণ নেই। হেডলাইট অফ করে দিল ও দশ মিনিট পর। কেবল সাইড লাইট জ্বলছে দু'পাশে।

ওরাও সাইড লাইট জ্বেলে এগোচ্ছে। অত্যন্ত ধীরগতিতে। দৈত্যাকার যাত্রীবাহী কোচের সুবিশাল এক কলাম। সাফোকের বারি সেন্ট এডমাণ্ডস অতিক্রম করছে ওরা এ মুহূর্তে। কেবল কোচই হবে দু'শোর বেশি। তার ওপর সামনের কার, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল এবং পদযাত্রীদের সংখ্যার তো কোন সীমা পরিসীমাই নেই। গজেন্দ্রচালে এগোচ্ছে লেবার পার্টির অ্যান্টি নিউক্লিয়ার মিছিল।

ব্যানার আর প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে আছে তার আগামাথা। শহর ছেড়ে এ ওয়ান ফর্টি থ্রী ধরে ইক্সওয়ার্থ জাংশনের দিকে এগোল মিছিল। ওখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ফের চলা শুরু হবে।

ডাউনহ্যাম মার্কেট ছাড়িয়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে এগোবার পর পুবদিকে ঘুরে গেল সামনের ওটা। ম্যাপের ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। এ ওয়ান থার্টি ফোর ধরেছে লোকটা। তার মানে থেটফোর্ড চলেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। সামনে চমৎকার একটি উজ্জ্বল দিনের আভাস। আধ ঘণ্টা পর কয়েক মাইল দীর্ঘ বিশাল বীচ, ওক আর পাইন বনে ঢুকল ওরা। দু'পাশে আকাশছোঁয়া সবুজ গাছ, মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে পথ।

বন পেরিয়ে গ্যালোম হিল। তারপরই থেটফোর্ড। শহরে ঢোকার আগে ফের থামতে হলো মাসুদ রানাকে। কারণ আবার থেমে দাঁড়িয়েছে

মোটর সাইকেল।

'আবার ডেঁড়িয়ে পড়েচে?' তেড়ে উঠল গিলটি মিয়া। রেগে উঠেছে।

রেঞ্জ ইণ্ডিকেটর পরীক্ষা করে বুঝল রানা, থেটফোর্ডের ঠিক মাঝখানে রয়েছে এখন লোকটা। কি করছে ওখানে সে? কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে? হতে পারে। এত দীর্ঘ পথ ড্রাইভ দিয়ে এসে খিদে ওর নিজেরও লেগেছে। দশ মিনিট অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা।

এক চুলও নড়ল না ব্লিপ পনেরো মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরও। কেমন সন্দেহ হলো রানার। ব্যাপার কি? লোকটা কি ওর গাড়িতে ব্লীপার প্ল্যান্ট করার ব্যাপার টের পেয়ে গেছে? জিনিসটা খুলে ফেলে দিয়ে কেটে পড়েছে? নাকি ওখানেই ওর ঘাঁটি? যাই হোক, চেক করে দেখার সময় হয়েছে এখন। আবার রওনা হলো রানা।

জেগে উঠেছে থেটফোর্ড। ব্লীপারের নির্দেশমত ম্যাগডালেন স্ট্রীটের একসার বন্ধ গ্যারাজের সামনে এসে থামল ওরা। গাড়ির নাক বার কয়েক ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ওর একটার সামনে স্থির করল মাসুদ রানা। টানা 'টুঁ-উঁ-উঁ' আওয়াজ করছে ব্লীপার। এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে পর্দার বিন্দুটা।

'ওটার ভেতর আছে লোকটা,' বলল মাসুদ রানা।

নেমে পড়ল সবাই গাড়ি থেকে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। যার যার অস্ত্র বের করে হাতে নিল প্রত্যেকে। তারপর পায়ে পায়ে এগোল। গ্যারেজের দরজায় তালা মারা নেই। ভেড়ানো আছে কেবল। বাঁ হাতে একটা পাল্লা ধরল মাসুদ রানা, লম্বা করে দম নিল। তারপর এক ঝট্‌কায় খুলে ফেলল দরজা। ডান হাতে উদ্যত ওয়ালথার পিপিকে। মুহূর্তে মুখটা কালো হয়ে উঠল ওর হতাশায়।

গ্যারাজের মাঝখানে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মোটর সাইকেলটা। ঘাড় কাৎ করে এক চোখে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে ওদের দিকে। যেন

নীরবে প্রশ্ন করছে, কারা তোমরা? কি চাও এখানে?

দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে রাইডারের লেদার জ্যাকেট, জিপ্ সাইডেড ট্রাউজার ও রেইনকোট। মেঝেতে পড়ে আছে জ্যাকবুট। মাটিতে আরও একজোড়া চাকার দাগ দেখে ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। ছোট আকারের কোন কারের হবে। বুঝে ফেলল রানা ব্যাপারটা। মোটর সাইকেল রেখে অনেক আগেই গাড়ি নিয়ে কেটে পড়েছে রুশ স্পাইটি। শেষ মুহূর্তে মস্ত এক ঠক্ দের দিয়ে গেছে ওদের লোকটা।

বারো

ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। অদ্ভুতরকম ধীরস্থির দেখাচ্ছে ওকে। 'লোকাল পুলিস স্টেশনে চলো।' ধারেকাছের যে কোন এয়ারবেস থেকে হেলিকপ্টার আনিয়ে ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

বেরিয়ে এল ওরা। পাঁচ মিনিটের পথ পেরিয়ে গ্রোভ লেনের পুলিস স্টেশনে পৌছল। ফ্রন্ট অফিসে একজন ডিউটি কনস্টেবলকে পাওয়া গেল। ভেতরে আছে আরেক সার্জেন্ট, চা পানে ব্যস্ত। নিজের পরিচয় এবং আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করল রানা ফ্রন্ট অফিসে। সব শুনে ঘাবড়ে গেল কনস্টেবল। ছুটে গিয়ে সার্জেন্টকে ডেকে নিয়ে এল। এই ফাঁকে রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করে দিয়েছে রানা। কথা বলতে চায় বিএসএস

চীফের সঙ্গে।

গিলটি মিয়া ভেতরে ঢোকেনি। দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। দুনিয়ার সব দেশের পুলিসের ওপরই তার সমান বিতৃষ্ণা। এই জাতটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই ভাল মনে করে সে।

সার্জেন্টকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল হ্যারি নিগেল, নতুন করে ব্যাখ্যা করতে লাগল ঘটনা। হাতে রানার তোলা তাতায়েভের পোস্ট কার্ড সাইজের একটা ছবি রয়েছে, ওটা দেখাল সে তাকে। সেই সঙ্গে মুখ চলছে দ্রুত। এই সময় থেটফোর্ড মোটর সাইকেল পেট্রোল টীমের এক কনস্টেবল স্টেশনের সামনে তার মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে অচেনা মুখগুলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা।

পাশ থেকে মাসুদ রানাকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর আলাপরত নিগেল আর সার্জেন্টের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ শুনেই বুঝে নিল লোকটা কি নিয়ে আলোচনা চলছে ওদের। সার্জেন্টের হাতে রয়েছে এখন তাতায়েভের ছবি। ওটায় চোখ বোলাল কনস্টেবল। পরক্ষণেই চরম বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখা গেল তার চোখেমুখে।

'আপনারা এই ভদ্রলোককে খুঁজছেন?' নিজেকে সামলাতে না পেরে কথার মাঝে কথা বলে উঠল কনস্টেবল।

'হ্যাঁ,' কথা থামিয়ে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল নিগেল। 'কেন?'

'লোকটিকে একটু আগেই দেখেছি আমি।'

'কোথায়!'

'ইক্সওয়ার্থ থর্পের সামান্য ওপাশে। আটকে গেছেন গাড়ি নিয়ে। মিছিলের জন্যে এগোতে পারছেন না।'

'কিসের মিছিল?' জানতে চাইল রানা। কথা শেষ করে উঠে এসেছে ও।

'সেকি!' অবাক হলো কনস্টেবল। 'আজ যে লেবার পার্টির অ্যান্টি নিউক্লিয়ার মিছিল হওয়ার কথা, জানেন না?'

'আপনি শিওর যে একেই দেখেছেন?'

'অফকোর্স, শিওর! আমি নিজেই তো থামিয়েছি তাকে। মিছিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত নড়ার উপায় নেই কোন গাড়ির। আর যে মিছিল, বাপরে! কয় ঘণ্টা লাগবে শেষ হতে কে জানে!'

দ্বিগুণ হয়েছে বেড়ে মিছিলের আকার। সহস্র কামানের মত গর্জন করছে জনতা অনবরত। সামনের লিটল্ ফেকেনহ্যাম নামে ছোট একটা গ্রাম তাদের গন্তব্য। ওখানকার হনিংটন ইঙ্গ-মার্কিন এয়ার ফোর্স বেজ ঘেরাও করা হবে। ব্যানারে ব্যানারে ছেয়ে আছে মিছিলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। সবগুলোর বক্তব্য প্রায় একই—ইয়াঙ্কস আউট!

কয়েক বছর আগে হনিংটন আরএএফ বেজের কোন গুরুত্ব ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটা টর্নেডো স্ট্রাইক বম্বার থাকত তখন এখানে। গুরুত্ব পাওয়ার মত তেমন কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ করেই গুরুত্ব বেড়ে গেছে এই ঘাঁটির, সারা দেশের নজর পড়ে গেছে ওর ওপর, যেদিন ইউএস এয়ার ফোর্সের গ্যালাক্সি ট্র্যান্সপোর্ট বিমান ক্রুজ মিজাইল নিয়ে অবতরণ করে ওই ঘাঁটিতে।

টর্নেডো বম্বার পরে আস্তে আস্তে সরে গেছে এখান থেকে স্কটল্যাণ্ডে। তার স্থান দখল করেছে মার্কিন এফ-একশো এগারো স্ট্রাইকার। সারাদিন এই এলাকা সরগরম থাকে ওদের গগনবিদারী হুঙ্কারে। কিছুদিন পরই শুরু হয়ে যায় স্থানীয়দের প্রতিবাদ বিক্ষোভ। এসব আগেও অনেক হয়েছে। কিন্তু আজকের মিছিল যেন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। কোলের শিশু নিয়ে গৃহিণীরা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আছে ওতে।

প্রেস, টিভি ক্যামেরার মিছিলটি সবার আগে। তাল রাখতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা ক্যামেরাম্যানদের। তবে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কারও মধ্যে জনসাধারণের সম্পত্তি ধ্বংস করার আগ্রহ দেখা গেল না। এত বড় এক মিছিলকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে পুলিসের দু'জন মাত্র মোটরসাইকেল আউটরাইডার।

থেটফোর্ড থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক গতিতে ইপসউইচগামী বড় রাস্তায় উঠে এল ভ্যালেরি তাতায়েভ। ক্লান্ত সে। বাসায় ফিরে ঘুম দেবে টানা। ইউসটন হল বর্ডার পার হয়ে সাফোকে ঢুকল মেজর। মাইলখানেক এগোতে পথের পাশে দাঁড়ানো পুলিসের এক মোটরসাইকেল আউটরাইডারের ওপর চোখ পড়ল তার। পথের পাশে বাইক স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা।

শক্ত হয়ে গেল তাতায়েভ। কি ব্যাপার! এ পথে বহুবার আশা-যাওয়া করেছে সে, কখনও কোন রাইডারকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। কেন দাঁড়িয়ে আছে লোকটা? ওকে থামাবার জন্যে? কিন্তু না। ওকে দেখল কেবল লোকটা, থেমে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিল না। সাঁ করে জায়গাটা পেরিয়ে এল তাতায়েভ। এক মাইল পেরিয়ে লিটল ফেকেন্‌হ্যাম পৌঁছল।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে দুটো সাদা রঙের রোভার পুলিস কার পার্ক করা আছে পথের পাশে। কাছেই জটলা করছে একদল সিনিয়র অফিসার। গাড়ির শব্দে মুখ তুলে চাইল লোকগুলো। এখানেও বাধা দেয়া হলো না তাতায়েভকে। ব্যাপারটা কি? ভাবছে সে, এত পুলিস কেন রাস্তায়? ফেকেনহ্যাম ছাড়িয়ে এসে ইক্সওয়ার্থ থর্প পৌঁছল সে, গির্জা ডানে রেখে এগোচ্ছে, আচমকা কলজে লাফিয়ে উঠল তার।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুলিসের এক কনস্টেবল, তাকে থামতে

বলছে। গতি কমাতে শুরু করল তাতায়েভ। করণীয় ঠিক করে ফেলেছে মুহূর্তে। ডোর প্যানেলের নিচের দিকের পকেটে ঢুকিয়ে দিল সে ডান হাত। ভেতরে উলের সোয়েটারে মোড়া রয়েছে তার ফিনিশ সাকো। ধারেকাছে আর কেউ নেই। এই সুযোগে লোকটাকে শেষ করে দিয়ে পালাবে সে।

এটা যে একটা ফাঁদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই ভ্যালেরি তাতায়েভের। কিন্তু তাহলে আর লোকজন কোথায়? ভাবতে ভাবতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল সে, টান টান হয়ে আছে স্নায়ু।

'সমস্যাটা কি, অফিসার?'

'সামনের রাস্তা বন্ধ, স্যার। যেতে পারবেন না। দেরি হবে।'

'কেন? বন্ধ কেন?'

'বড় একটা মিছিল আসছে এদিকে। ওটা ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত···ওই চার্চের সামনে গাড়ি পার্ক করতে হবে আপনাকে, স্যার। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঝামেলা বিদেয় হবে আশা করি।'

ব্যাটা চালাকি করছে না তো? ভাবতে ভাবতে ধীরগতিতে গজ পঞ্চাশেক এগোল ভ্যালেরি তাতায়েভ। গির্জার সামনের খোলা জায়গায় সেলুন দাঁড় করাল। তারপর লুকিং গ্লাসের ভেতর দিয়ে পিছনে তাকাল। না, ওর দিকে কোন খেয়াল নেই পুলিসটির। আরেকটা গাড়ির গতিরোধ করতে ব্যস্ত সে। দু'মিনিট পর ওটাও দাঁড়াল এসে তাতায়েভের পিছনে। হুঁম! ভাবল সে, তার মানে সত্যি কথাই বলেছে লোকটা।

কিন্তু ঝামেলা তাতে কমল না তার। ভেবেছিল তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে বিশ্রাম নেবে, হলো না তা। গ্লাসে চোখ রেখে বসে থাকল তাতায়েভ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দশ বারোটা গাড়ি জমে গেল তার পিছনে। ওদিকে আরেক আউট রাইডার এসে পৌঁছল। প্রথমজনকে কি যেন বলল সে। দু'জনে হাসল খানিক। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে থেটফোর্ডের

দিকে ফিরে গেল প্রথমজন। পরেরজন রইল তার জায়গায়। শিফট্ বদল হলো বোধহয়, ভাবল তাতায়েভ।

পাক্ খেয়ে আরও খানিকটা ওপরে উঠল 'কপ্টারটা। পাইলট এবং ওপাশের জানালা ঘেঁষে বসা মাসুদ রানার মাঝখানে বসে আছে কনস্টেবল। সবার নজর নিচের জনস্রোতের ওপর। অবাক হলো মাসুদ রানা। এতবড় মিছিল আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

'ওই যে সেই গির্জা,' হাত তুলে দেখাতে যাচ্ছিল কনস্টেবল, ধরে ফেলল রানা হাতটা।

'হাত দেখাতে হবে না। মুখে বলুন।'

'উই যে, একদম আগের সেলুনটা, ওটাই।'

ভাল করে তাকাল মাসুদ রানা। মিছিলের প্রায় সিকি অংশ ততক্ষণে গির্জার এদিকে পৌঁছে গেছে। ওটার আকার দেখে খানিক সাহস এল বুকে ওর, কম করেও আরও এক ঘণ্টা আটকে থাকতে হবে লোকটাকে। কাছে চলে এসেছে গির্জা। এবার তাকে দেখতে পেল রানা। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জনতার দিকে চেয়ে আছে।

হ্যাঁ, এই-ই সেই। বিনকিউলারে মুখটা একবার দেখে নিয়েই ঝট্ করে ওটা নামিয়ে নিল মাসুদ রানা। এক পলকেই তাকে চিনতে পেরেছে ও। ইশারায় পাইলটকে 'কপ্টার ঘোরাতে বলল রানা। ফিরে চলল ওটা থেটফোর্ড।

'ইপসউইচ পুলিসকে কি জানাব, স্যার?' প্রশ্ন করল সার্জেন্ট। মাসুদ রানার ওপর রীতিমত শ্রদ্ধা জন্মে গেছে তার। এখানে ওখানে ফোন করে যে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে লোকটা, রীতিমত অবিশ্বাস্য।

নিমগ্ন হয়ে ম্যাপ দেখছে মাসুদ রানা। আকাশে কয়েক চক্কর দিয়ে

এইমাত্র ফিরে এসেছে ও। ইক্সওয়ার্থে যখন আটকেছে লোকটা, তখন ছাড়া পাওয়ার পর হয় স্টোমার্কেট অথবা ইপসউইচ যাবে সে। তবে যেদিকেই যাক, রাস্তা একটাই পরেরটায় যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, ভাবল রানা। কারণ জায়গাটা একজন ইললিগ্যালের গা ঢাকা দেয়ার জন্যে আদর্শ স্থান। 'বলবেন, স্টোমার্কেটে আমার জন্যে একটা গাড়ি আর দুটো মোটর সাইকেল রেডি রাখতে। এখনই রওনা হব আমরা।'

রানার বক্তব্য দ্রুত রিলে করল সার্জেন্ট টেলিফোনে। বিএসএস চীফের সরাসরি নির্দেশ পেয়েছে সে মাসুদ রানাকে যতরকম সহায়তা প্রয়োজন, করতে। কাজেই রানা যা বলছে, বিনা প্রশ্নে তাই করে যাচ্ছে সে। একই নির্দেশ ইপসউইচ পুলিসও পেয়েছে লণ্ডন থেকে। সার্জেন্টকে জানাল তারা, এখনই পালন করতে যাচ্ছে তারা মাসুদ রানার নির্দেশ।

রিসিভার রেখে বিনয়ের সঙ্গে রানার আর কিছু প্রয়োজন কি না, জানতে চাইল সার্জেন্ট। 'চেস্টারফিল্ডের পুলিস সুপার স্যাম রসটনের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল রানা।

দুই মিনিটে জানা হয়ে গেল যা জানতে চেয়েছিল ও। হ্যাঁ, জানালেন উচ্ছ্বসিত সুপার, আপনার ধারণাই ঠিক। ফ্ল্যানারির ঠিকানাটা ব্লাইণ্ড। ওই ঠিকানায় নেই কেউ ও নামে। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার সার্জেন্টের হাতে তুলে দিল রানা।

সকাল নয়টা। রাস্তার পাশে গাড়ির এঞ্জিন কভার তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। গত আধ ঘণ্টা ধরেই দাঁড়িয়ে আছে ও, একের পর এক সিগারেট টেনে সময় পার করছে। গিলটি মিয়া ভেতরে বসা। ওরা রয়েছে স্টোমার্কেটের এপাশে। ওদিকে ব্রায়ান স্মিথ আর হ্যারি নিগেল দুই মোটর সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে সামনে।

সাড়ে ন'টার দিকে দূর থেকে চোখে কাঁচের প্রতিফলিত আলো পড়ল

মাসুদ রানার। আসছে ইপসউইচ বাউণ্ড ট্রাফিক! ঝুঁকে পড়ল ও এঞ্জিনের ওপর। ঠিক চার মিনিট পর হুশ্-শ্ করে ওকে পাশ কাটাল ভ্যালেরি তাতায়েভ। মাঝখানে আরেকটা গাড়ি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর এঞ্জিন কভার বন্ধ করে ঝটপট্ উঠে পড়ল গাড়িতে। মাঝের বাধাটার জন্যে এখন তাকে দেখতে পাচ্ছে না তাতায়েভ। ছুট্ লাগাল মাসুদ রানা।

স্টোমার্কেট পেরিয়ে এসে পথে আরও দুটো মোটর সাইকেলকে পাশ কাটাল ভ্যালেরি। কিন্তু এখন ওসব দিকে নজর দেয়ার সময় নেই তার, তুমুল গতিতে ধেয়ে চলেছে সে। হুইটনের সামান্য আগে ডানে বাঁক নিয়ে শিভালিয়ার স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল তাতায়েভ। তারপর অঁরওয়েল নদীর ওপরকার হ্যাণ্ডফোর্ড ব্রিজ পেরিয়ে রেনেলাগ রোডে পড়ল।

ব্যাটা ইপসউইচ থামছে না, ভাবল মাসুদ রানা। বেলস্টেড রোডে গিয়ে পড়েছে তখন সেলুন। ইপসউইচ থেকে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে রাস্তাটা, কলচেস্টারের দিকে। শেষ মুহূর্তে আচমকা বাঁক নিল গাড়িটা বাঁয়ে, ঢুকে পড়ল ইপসউইচ হাউজিং এস্টেট কমপ্লেক্সে। কয়েকশো গজ পিছনে খুদে একটা মার্কেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। সামনের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। কোন বাড়িতে ঢুকল সেলুনটা বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না ওর।

একটার দিকে ঘুম ভেঙে গেল ভ্যালেরি তাতায়েভের। ভাল ঘুম হয়নি। অথচ যে ধকল গেছে গত প্রায় বারো ঘণ্টা, হওয়া উচিত ছিল। বিছানায় উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল সে ঝাড়া দশ মিনিট। নেটের পর্দার ভেতর দিয়ে উল্টোদিকের বাড়িটার সামনে চার-পাঁচজন লোককে দেখতে পেল তাতায়েভ। কারা ওরা?

পরক্ষণে ওদের অতি বিনয়ী ভাব-সাব দেখে বুঝল, নিশ্চয়ই

ক্যানভাসার। ভোট চাইতে এসেছে। মুচকে হাসল তাতায়েভ। বাথরুমে ঢুকে গোসল-শেভ সেরে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এল। নিচতলার কিচেনে এসে হালকা কিছু খাবার তৈরি করে পেটে চালান করল। ওর ফাঁকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে পিছনের খুদে বাগানটার দিকে তাকাল সে কয়েকবার।

বাগানে ঢোকার পিছনের গেটের ভেতরদিকে, বাগানের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত একটা মিহি, প্রায় অদৃশ্য ফিশিং লাইন বাঁধা আছে। তাতায়েভ নিজেই বেঁধেছে। হাঁটু সমান উচ্চতায়। যেখানে যেখানে ফুলের গাছ আছে, ঠিক তার আড়ালে আবডালে; যাতে বাইরে থেকে কিছুই টের না পাওয়া যায়, এক ইঞ্চি ব্যবধানে বেশ কিছু খালি টিন ক্যান ঝুলিয়ে রেখেছে সে ওই লাইনের সঙ্গে।

কেউ যদি ওই পথে প্রবেশ করতে চায়, নিঃসন্দেহে ফাঁদটায় পা দিয়ে ফেলবে সে। ক্যানের সংঘর্ষের আওয়াজে সতর্ক হয়ে উঠবে তাতায়েভ। বেরিয়ে যাওয়ার সময় লাইনের এক প্রান্ত খুলে রেখে যায় সে। যখন বাসায় থাকে, তখনই ওটা টানা থাকে। যেমন থাকার কথা, ওটা তেমনি আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলো ভ্যালেরি।

সাঁঝ গড়িয়ে গেছে। বারো নম্বর চেরিহে'জ ক্লোজের পিছনে বাগানের বাইরে, একটু দূরে মাটিতে বসে আছে মাসুদ রানা, গিলটি মিয়া এবং আরেকজন- জিম প্রেসটন। জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকার। জরুরি তলব দিয়ে লণ্ডন থেকে আনিয়ে নিয়েছে ওকে মাসুদ রানা। যা-তা কথা নয়, হেলিকপ্টার নিয়ে ওস্তাদ নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। নিজেকে খুব বড় কেউকেটা মনে হচ্ছে জিম প্রেসটনের।

এই মুহূর্তে নাইটগ্লাস দিয়ে বাড়িটার পিছনের বাগান পর্যবেক্ষণ করছে সে। দোতলার বেডরুমে আলো জ্বলছে বাড়িটার। জানালার পর্দায় মাঝেমধ্যে ছায়া দেখা যাচ্ছে একটা, হাঁটাহাঁটি করছে। লোকটা এ বাড়ির বাসিন্দা—মার্টিন ফ্ল্যানারি।

'একটা কিছু আছে মনে হয়, স্যার,' নাইটগ্লাস নামিয়ে রানার দিকে তাকাল প্রেসটন।

'কি ধরনের?'

মাথা চুলকাল লোকটা। 'আমরা একে বলি লাইন-ট্র্যাপ। সরু, মজবুত সুতোয় বেঁধে খালি ক্যান টিন ঝুলিয়ে রাখা। অসাবধানে ক্রস করতে গেলে পায়ে লেগে শব্দ ওঠে, সেই জন্যে পাতা হয় এ-ফাঁদ।'

'লাইনটা দেখতে পেয়েছ?'

'না, স্যার। তবে কয়েকটা ক্যান দেখেছি। লাইন খোঁজার প্রয়োজন নেই, ডিঙিয়েই চলে যেতে পারব আমি।'

সন্দেহ গেল না মাসুদ রানার। 'পারবে তো! না হলে কিন্তু... ।'

যেন লজ্জা পেয়ে গেছে, মুখ নামিয়ে আবার মাথা চুলকাল প্রেসটন। আড়চোখে ওস্তাদের দিকে তাকাল একবার।

'ও হলো, স্যার, বাগের বাচ্চা,' ওকালতি করল গিলটি মিয়া। 'ওসব কোন ব্যাপারই নয় ওর কাচে।'

'বেশ। তৈরি হও।'

কাঁধের ঝোলাটা টেনে সামনে নিয়ে এল প্রেসটন, ধরে থাকল একহাতে। তারপর পা বাড়াল আড়ালে আড়ালে। নজর দোতলায়, বেডরুমের জানালায়। আবার দেখা গেল ছায়াটা। এখনও হাঁটাহাঁটির ওপরেই আছে লোকটা। নেটের বেড়া ডিঙিয়ে সন্তর্পণে ঢুকে পড়ল প্রেসটন বাগানে। ক্যানগুলোর ওপর সতর্ক চোখ রেখে লাইনটা টপকাল। পর মুহূর্তে মিশে গেল অন্ধকারে।

দরজার সামনে বোঁচকাটা নামিয়ে বসে পড়ল সে হাঁটু গেড়ে। লেগে পড়ল কাজে। দরজার তালাটা দেখে হাসি পেল প্রেসটনের। একেবারে সাধারণ ইয়েল লক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে বলে সময় একটু বেশি লাগল। বিশ মিনিট পর ফিরে এল সে। তুলে দিল চাবিটা মাসুদ রানার হাতে।

তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'ওয়েল ডান।'

থুত্নি নেড়ে আদর করল গিলটি মিয়া শিস্যকে। 'কেমন, স্যার, বলিনি, ও হচ্চে' গে বাগের বাচ্চা!'

নিচে নেমে এল মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভ। কেন যেন অস্থির লাগছে। টিভি অন্ করে তাতে মন বসাতে চাইল, হলো না। কিছুই ভাল লাগছে না। কেন যেন টান-টান হয়ে আছে স্নায়ুগুলো। বাইরের রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি গেলেই চমকে উঠছে সে। সাকো অটোমেটিকটা সামনের সেন্টার টেবিলে রেখেছিল তাতায়েভ, তুলে নিল আবার।

আমি কি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি? নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, কিন্তু কেন? দূর! নিজের ওপর চটে উঠল সে। হাতঘড়ি দেখল, দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বরং মস্কো রেডিওর কমার্শিয়াল শোনা যাক। দেখা যাক, কোন সংবাদ থাকে কি না ওর জন্যে। থাকতে পারে। কারণ তাতায়েভ ওর তরফ থেকে শেষ খবর জানিয়ে দিয়েছে ওদের।

টিভি অফ্ করে রেডিও খুলল সে। সেই একই সময়ে, পিছনের দরজার তালা খুলে ফেলেছে মাসুদ রানা। সময় নির্ধারণ করেই দুদিক থেকে এগিয়েছে ওরা। ঠিক দু'মিনিট পর প্রকাণ্ড একটা ঢিল এসে পড়ল বাড়ির সামনের কাঁচের দরজায়। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেরি তাতায়েভ। হতভম্বের মত ঘুরে তাকাল। পর মুহূর্তে পড়ল আরেকটা ঢিল। পিছনে নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে পড়ল ঘরে মাসুদ রানা। ওয়ালথার বাগিয়ে পায়ে পায়ে এগোল। কোথায়, নিশ্চয়ই দোতলায় আছে লোকটা, ছুটে আসবে এখনই।

আরও দু'পা এগোতেই লোকটাকে দেখতে পেল ও। প্রচণ্ড রাগে টকটকে মুখটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তাতায়েভের। ছুটে বেরিয়ে আসছে সীটিংরুম থেকে। হিসেবে সামান্য ভুল হয়ে গেল। রানা ভেবেছে দোতলায়

আছে সে। কাঁচ-ভাঙার শব্দে নেমে আসবে, তখনই পিছন থেকে তাকে কাবু করবে ও। কিন্তু লোকটা যে নিচে থাকবে, ভাবেনি। পলকে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে রানাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে, বিদ্যুৎগতিতে অস্ত্র তুলেই টেনে দিল ট্রিগার। কিন্তু আগেই বসে পড়েছে রানা ঝপ্ করে। ওর অন্তত এক সেকেণ্ড আগে শত্রুকে দেখতে পেয়েছে রানা, সময়টা কাজে লাগাতে ভুল হয়নি ওর।

রানা জানে লোকটা 'স্পেৎস্নাজ', কেজিবির সর্বোচ্চ ট্রেনিং পাওয়া এলিট স্যাবোটিয়ার। একে বিন্দুমাত্র আণ্ডারএস্টিমেট করা মানেই পলকে মৃত্যু। কাজেই তাকে কোন সুযোগ দিতে পারে না ও। পিস্তল তুলেই গুলি করল মাসুদ রানা। তাতায়েভের বাঁ দিকের বুকে ছোট্ট একটা ফুটো করে ঢুকে গেল বুলেটটা।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল ভ্যালেরি, পলকে বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। বুলেটের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল এক পা। ওই অবস্থায়ই আবার গুলি করল সে, গর্জে উঠল সাকো অটোমেটিক। রানার কানের পাশ দিয়ে 'বিঙ' শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বিষাক্ত বুলেট। পর পর আরও দুটো গুলি করল মাসুদ রানা, উড়ে গিয়ে পিছনের সোফার ওপর আছড়ে পড়ল তাতায়েভ।

ওই অবস্থায়ই শূন্যে উঠে গেল তার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত, অস্ত্রটা নেই ওখানে, পড়ে গেছে। প্রচণ্ড আক্ষেপে চেঁচিয়ে কি যেন বলতে গেল লোকটা, কিন্তু শেষ করতে পারল না। এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, আটকে দিল কথাটা। শিথিল হাতটা থপ করে দেহের পাশে নেতিয়ে পড়ল। মারা গেছে মেজর ভ্যালেরি আলেক্সেইভিচ তাতায়েভ।

মৃত মেজরের কানের কাছে বাজছে রেডিও। 'রেডিও মস্কোর ইংরেজি ভাষার অনুষ্ঠান থেকে প্রিয় শ্রোতাদের জানাই শুভরাত্রি। এখন শুনুন দশটার খবর। প্রথমে শিরোনাম। তেরি..., আমি দুঃখিত, তেহরান থেকে

পাওয়া খবরে... ।'

এগিয়ে এসে সেটটা অফ করে দিল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্ত অপলক চেয়ে থাকল তাতায়েভের খোলা চোখের দিকে। কী এক অব্যক্ত বেদনা, হতাশা যেন রয়েছে ওখানে।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

জেনেভা। সাত দিন পরের ঘটনা। কেজিবির এক সেফ হাউস। চার তলার জানালা দিয়ে নিচের রাস্তা দেখছেন জেনারেল ভ্লাদিমিরোভিচ বরিসভ। ঠিক সময়মতই পৌঁছুল যুবক। সেফ হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল একটা নীল কর্টিনা। পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে।

দীর্ঘদেহী। পরনে চমৎকার ছাঁটের গ্রে স্যুট। সাদা শার্ট। হাতে বোনা লাল টাই। চুল ব্যাক ব্রাশ করা। হাতে একটা ব্রিফকেস। তিন মিনিট পর জেনারেলের মুখোমুখি বসা দেখা গেল যুবককে। ব্রিফকেস খুলে একটা ফাইল জেনারেলের দিকে এগিয়ে দিল আগন্তুক।

'এর মধ্যে আপনি যা যা চেয়েছিলেন সব পাবেন, কমরেড জেনারেল।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার মাসুদ রানা,' অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ফাইলে চোখ বোলাতে শুরু করলেন জেনারেল। খস্ খস্ করে দু'তিনটে পৃষ্ঠা উল্টে গেলেন। পড়লেন না, কেবল দেখে অনুমান করে নিলেন কি আছে এতে। সশব্দে ফাইল বন্ধ করে আবার বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

চেয়ে থাকল রানা জেনারেলের দিকে। ওই ফাইলে আছে মেজর ভ্যালেরি তাতায়েভের 'জবানবন্দী'। 'ধরা পড়ার' পর বিএসএসকে বাধ্য হয়েছে সে 'সব জানাতে'। লিপিবদ্ধ আছে তা এই ফাইলে। প্ল্যান অরোরার সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি। যার পূর্ণ বিবরণ ক'দিন আগে জেনারেল নিজেই রানার হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর এক লণ্ডন রেসিডেন্টুরার

সাহায্যে। এই 'জবানবন্দীর' একটি কপি নিয়ম অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা।

তবে যে জন্যেই হোক, ব্রিটিশ সরকার এমন দুনিয়া কাঁপানো ষড়যন্ত্রের খবরটি এখনও চেপে রেখেছে। প্রেসকে জানায়নি।

'আপনার উদ্দেশ্য কি জেনারেল? এগুলো দিয়ে কি করতে চাইছেন?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেনারেল। 'তার আগে বলুন, এগুলো, কাগজগুলো খাঁটি কি না।'

'সম্পূর্ণ খাঁটি। ব্রিটিশ ডিফেন্স মিনিস্ট্রির এক্সপার্টরা নিজ হাতে ডকুমেন্টগুলো তৈরি করেছেন আমার অনুরোধে।'

'আমি যে এগুলো চেয়েছিলাম, আপনি আর জেনারেল রাহাত খান ছাড়া আর ক'জন জানে?'

'বিএসএস চীফ আর মিনিস্ট্রির দুই এক্সপার্ট। আপনি যা ভাবছেন, তার কোন সম্ভাবনাই নেই। কোনমতেই এর গোপনীয়তা ফাঁস হবে না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। 'মেজর ভ্যালেরির জন্যে খুব খারাপ লাগছে, মিস্টার রানা। ওর মত খাঁটি হীরে জীবনে খুব কমই নজরে পড়েছে আমার।'

'আমি দুঃখিত, কমরেড জেনারেল। ওরকম পরিস্থিতিতে...'

'আমি বুঝি, ইয়াং ম্যান। বুঝি। আপনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আমি ভাবি তাদের কথা যারা ওকে এ কাজে পাঠিয়েছিল। সে যাকগে, কি যেন জানতে চেয়েছিলেন? ও, হ্যাঁ। কি করব ওগুলো দিয়ে, না? মেজর বাষট্টির কিউবা মিজাইল সঙ্কটের কথা মনে আছে আপনার?'

'আছে।'

'সঙ্কটটা সৃষ্টি করেছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চভ। পুরো বিশ্বকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তাঁর সেই হঠকারী সিদ্ধান্ত। এই অভিযোগে চৌষট্টিতে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন মিখাইল সুসলভ। এই

দলিলগুলোর সাহায্যে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলেছি আমি।'

'আপনাদের জেনারেল সেক্রেটারি এমন একটা কাজ কেন করতে গিয়েছিলেন?'

'শুধুই নাম কেনার আশায়। নিজেকে অমর করে রাখার জন্যে। অবশ্য তাঁকে ইন্ধন জুগিয়েছিল অন্যরা।' চেহারা কঠোর হয়ে উঠল জেনারেলের। 'ওদের একজনকেও আমি ছাড়ব না।'

'ধরে নিতে পারি আপনি এর পিছনে রাজনৈতিক সমর্থন পাবেন?'

'একশোবার! পলিটব্যুরো সমর্থন দেবে আমাকে। তবে আগে তাদের এগুলো,' ফাইলের গায়ে টোকা দিলেন তিনি, 'দেখাতে হবে। তারপর। আমি মস্কো ফিরে যাওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সোভিয়েত ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লিখিত হবে।'

'আরেকটা প্রশ্ন। অস্ট্রিয়ান ফ্রানজ ওসনিয়াক কেন গিয়েছিল চেস্টারফিল্ডে?'

'নিয়মিত মিশনে। ট্র্যান্সমিটার এবং তার দুই রক্ষকের খোঁজ-খবর নিতে-প্রতি মাসে একবার ওখানে যেত সে।'

এই লোক যদি না যেত চেস্টারফিল্ড, মাসুদ রানা নিশ্চিত, ও কেন, কারও পক্ষেই কিছু করা সম্ভব হত না। 'অল রাইট, কমরেড জেনারেল,' উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাল ও। 'আশা করছি আপনার মিশন সফল হবে। চলি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেন্টলম্যান, অ্যাণ্ড গুড বাই। আবার দেখা হবে।'

দরজার কাছে এসে পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। হ্যাঁ, হয়তো হবে, ভাবল ও। হয়তো আর কোথাও। হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে তখনকার পরিবেশ। আমার বুকে অস্ত্র ধরবেন হয়তো তখন আপনি, অথবা আমি আপনার। দায়িত্ব ও কর্তব্যের কী বিচিত্র খেলা।

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

***

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২৩-৮-৯৪ আমি রবিন বলছি (প্রজাপতি থ্রিলার) রকিব হাসান

বিষয়: কিশোর বন্ধুরা, আমি রবিন মিলফোর্ড। হ্যাঁ, তিন গোয়েন্দার রবিন।... বাংলাদেশে আরও গিয়েছি আমরা—আমি, মুসা, কিশোর। জানানো হয়নি তোমাদের। এ-বইতেই বিস্তারিত জানতে পারবে সব। নাও, এবার পড়ে ফেলো আমাদের,অর্থাৎ তিন গায়েন্দার, আরেকটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

২৩-৮-৯৪ মধুযামিনী (রোমান্টিক) শেখ আবদুল হাকিম

বিষয়: লিলি—ভালবাসা শুধু দিতেই জানে। ফিউরি—জড়সুদ্ধ ভালবাসা উপড়ে ফেলতে চায়। আছে ভালবাসার কাঙাল—রায়হান। আর আছে পাগলামি ও মহানুভবতায় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী—শাহীন।...তবুও জন্ম নেয় প্রেমের চারা।

আরও আসছে

২৫-৮-৯৪ কুয়াশা (৪৬, ৪৭, ৪৮) ভলিউম ১৬ কাজী আনোয়ার হোসেন
২৮-৮-৯৪ রহস্যপত্রিকা (১০ বর্ষ ১১ সংখ্যা সেপ্টেম্বর '৯৪)